হাটহাজারী ও পটিয়া মাদরাসার ফতোয়া সম্বলিত

শরিয়ত ও ইতিহাসের আলোকে

জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. এর শরয়ী বিধান

(প্রচলিত মিলাদ, কিয়াম, জশনে জুলুস, ঈদে মীলাদুন্নবী, হাযির-নাযির ও আলিমুল গায়েব ইত্যাদির শরয়ী বিধান)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.

রচনায়

মুফতি হোসাইন আহমদ (জাবের)

তাকমিল ও ইফতা, দারুল উলূম হাটহাজারী

উস্তাজ, জামিয়া কারীমিয়া আরাবিয়া রামপুরা, ঢাকা।

শরিয়ত ও ইতিহাসের আলোকে

জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. এর শরয়ী বিধান

[প্রচলিত মিলাদ, কিয়াম, জশনে জুলুস, ঈদে মীলাদুন্নবী, হাযির-নাযির ও আলিমুল গায়েব ইত্যাদির শরয়ী বিধান]

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.

বিশিষ্ট মুফতি ও মুহাদ্দিস

দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

—সাবেক প্রধান মুফতি ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস

জামিয়া বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়

মুফতি হোসাইন আহমদ (জাবের)

তাকমিল ও ইফতা, দারুল উলূম হাটহাজারী

উস্তাজ, জামিয়া কারীমিয়া আরাবিয়া রামপুরা, ঢাকা।

মাকতাবাতুশ শামেলা

মাদরাসা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

শরিয়ত ও ইতিহাসের আলোকে
জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. এর শরয়ী বিধান

রচনায়
মুফতি হোসাইন আহমদ (জাবের)
বিন আলহাজ্ব মাওঃ জাকের উল্যাহ দা.বা.
E-mail: hossainjaber9@gmail.com
01814791132

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুশ শামেলা
মাদরাসা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
০১৮৫৬৪৫৭১৭২

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৪ ইং

মূল্যঃ ৬০.০০ (ষাট) টাকা

প্রাপ্তিস্থান
দেশের সকল অভিজাত লাইব্রেরী সমূহ।

উৎসর্গ

ইসলামি সমাজ সংস্কার বিপ্লবের চার কিংবদন্তি

ইমামে রব্বানি শায়খ আহমদ সারহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.
(হি.৯৭০-১০৩৩। খ্রি.১৫৬৪-১৬২৪)

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ.
(হি. ১১২৪-১১৮৩। খ্রি.১৭০৩-১৭৬২)

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলি থানবি রহ.
(হি. ১২৮০-১৩৬২। খ্রি.১৮৬৩-১৯৪২)

মুজাদ্দিদে যমান মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ আল্লামা মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.

(হি. ১৩১০-১৩৯৬ ।খ্রি.১৮৯০-১৯৭৬)

যাদের সাধনা, সংস্কার ও আত্মত্যাগের বদৌলতে উপমহাদেশে ইসলাম আজো আপন স্বকীয়তায় বহাল আছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদের রেখে যাওয়া সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার তাওফিক দান করুন এবং তাদের কে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন, আমিন।

সূচীপত্র

পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সিপাহসালার আওলাদে রাসূল সা. হযরত আল্লামা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সুযোগ্য খলীফা, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক) এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহামান্য আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফি সাহেব দা.বা. এর

দোয়া ও অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

রাসূলে কারিম সা. এর ভবিষ্যত বাণীর আলোকে শেষ যুগে বহুমুখী ফিৎনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়া অনস্বীকার্য। যা হয়েছে ও প্রতিনিয়ত হয়ে চলছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ, প্রত্যেক যুগের ওলামায়ে কেরাম স্ব-স্ব যুগের ফিৎনা ফাসাদের প্রতিকূল অবস্থাতেও রাসূল সা. এর সুন্নাতের সঠিক নিয়ম নীতি পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণসহ প্রচার-প্রসার করে গেছেন এবং বিদআত ও নবাবিষ্কৃত কুসংস্কারের গ্রাস থেকে দ্বীনকে হেফাজত করে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। (আমিন)

এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ দিন আমার পাশে থাকা আমার একান্ত প্রিয় ছাত্র মুফতি হোসাইন আহমদ (জাবের) প্রচলিত জশনে জুলুস, মিলাদ-কিয়াম, হাযির-নাযির ইত্যকার বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সম্বলিত "শরিয়ত ও ইতিহাসের আলোকে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা." নামক একটি ফাতাওয়া গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে কুরআন হাদীসের আলোকে প্রচলিত মীলাদ কিয়াম ও ঈদে মীলাদুন্নবীর শরঈ হুকুম, ইতিহাস, ভ্রান্ত দলিলের জবাব প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা পুস্তিকাটি যেন কবুল করেন এবং লেখকের ইলমি-আমলি উন্নতি দান করেন। লেখককে আরো বেশী বেশী দ্বীনী খেদমত করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

মুহতাজে দোয়া-

আল্লামা শাহ আহমদ শফি
মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
তারিখ ঃ ১০-৭-২০১৩ইং

যেভাবে এ বিষয়ে কলম ধরা

প্রতিটি মুহূর্তে যাদের কথা মনে পড়ে, যাদের সংশ্রবের আশায় অন্তর সর্বদা ব্যাকুল থাকে, তারা হলেন আমার প্রাণপ্রিয় শায়খ ও মুর্শিদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি সাহেব দা.বা.ও নিভৃত জ্ঞান সাধক, মহান বুযুর্গ, মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ, হযরতুল আল্লাম মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.। হে আল্লাহ তুমি উভয় বুযুর্গের সুস্থতাপূর্ণ হায়াতে তাইয়্যিবা বাড়িয়ে দাও। দেশ ও জাতিকে তাদের থেকে আরো বেশী করে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দাও।আমিন।

দারুল উলুম হাটহাজারীতে দারুল ইফতায় অধ্যয়ন কালীন অবস্থায় একদিন মুফতি আব্দুস সালাম দা.বা. বললেন, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক শায়খুল হাদিস, বিদগ্ধ আলেমেদ্বীন হযরতুল আল্লাম গাজী সাহেব হুজুর রহ. যখন মুমূর্ষ অবস্থায়, তখন আমি হাসপাতালে হুজুরকে দেখতে যাই। হুজুর বললেন, আপনার দারল ইফতা থেকে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. সম্পর্কে যে বই বের হয়েছে, মাশাআল্লাহ তা খুব সুন্দর হয়েছে, আপনি বইয়ের উপর আরেকটু কাজ করেন। মিলাদ-কিয়াম,জশনে-জুলুস ইত্যাদি বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তৈরী করে বিদআতীদের বড় বড় মারকাজ-মাদ্রাসায় পাঠান। তারা যে সব দলিল দিবে সেগুলোর উত্তর দিবেন এবং আমাদের দেওবন্দি বড় বড় জামিয়ায়ও প্রশ্ন গুলো পাঠান। সব গুলোর সমন্বয়ে বইটি দ্বিতীয় সংস্করণে বের করেন।

মুফতি আযম দা. বা. বলেন, গাজী সাহেব হুজুর রহ. তো মারা গেলেন, কিন্তু তার এ অসিয়্যত পুরা হল না, এই বলে হুজুর নিজেই আমাকে কিছু প্রশ্ন তৈরী করে দেন এবং তা আমাদের বিভিন্ন জামিয়ায় ও বিদআতীদের বড় বড় মাদ্রাসা সমূহে পাঠানোর জন্য বললেন। হুজুরের কথা অনুযায়ী দারুল উলূম হাটহাজারী থেকে ঐসব প্রশ্ন গুলোর উত্তর আমি নিজেই লিখলাম। আল জামিয়া পটিয়া সহ আমাদের কয়েকটি জামিয়ায় প্রশ্নগুলো পাঠালাম। কিন্তু শুধু পটিয়ার উত্তরটিই হাতে এসে পৌছল। এমনিভাবে বিদআতীদের ও কয়েকটি মাদ্রাসায় পাঠানো হলো, কিন্তু তাদের একটি মাদ্রাসা থেকেও উত্তর হাতে এসে পৌছল না। আমারও অনেক দুর্বলতা

ছিল। সে যাই হোক, হাটহাজারীর দারুল ইফতা থেকে ফতোয়া লিখার পর হুজুর পুরাটা শুনলেন কিন্তু নিজে স্বাক্ষর না দিয়ে অন্যান্য হুজুরদের থেকে স্বাক্ষর নিয়ে আসার জন্য বললেন। সবার থেকে স্বাক্ষর নেয়ার পর হুজুর পুনরায় পুরাটা শুনলেন, স্বাক্ষর দেয়ার জন্য ফতোয়া হাতে নিয়েও দিলেন না। কয়েকবারই এমন হল। শেষ পর্যন্ত হুজুরের স্বাক্ষরটা আর হলো না। যা আমার একান্ত কাম্য ছিল। কারণ হুজুরের স্বাক্ষর ব্যতিত ফতোয়ার উপর আমার ইতমিনান (প্রশান্তি অনুভব)হয় না। মূলত হুজুরের ইচ্ছা ছিল বিদআতী মাদ্রাসা থেকে উত্তর আসার পর ওখানে যদি কোনো সমস্যা থাকে ওগুলোরও সমাধান দিয়ে ফতোয়া লিখা।

নিজের অযোগ্যতা, অলসতার ও সময়ের অপ্রতুলতার কারণে আমি তা করতে পারলাম না। তাই স্বাক্ষরও হলো না। এভাবে বৎসর শেষ হলো। আমি ঢাকায় চলে আসলাম। "শরিয়তের আলোকে ভোট দিব কাকে?" নামক বইয়ের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। যখন বইটি বের হলো, তখন ভাবলাম, সামনে যেহেতু রবিউল আউয়াল তো জশনে জুলুসের সেই লেখাটি সর্বসাধারণের সামনে আসলে ভালো হয়। কাজ শুরু হল, হযরত মুফতি আযম দা.বা. এর দারুল ইফতার মুফতি কামাল হোসাইন মোমেনশাহী রচিত জশনে জুলুস সম্পর্কে সে বই থেকে কিছু প্রমাণাদি সংযুক্ত করে "শরিয়ত ও ইতিহাসের আলোকে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা." এর কাজ সমাপ্ত হল। ফাহাদ হাসান, ওমর ফারুক ফেনবী ও মুহাম্মাদ ইব্রাহিম সহ আরো যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ এ বইকে কবুল করুন। ধর্মপ্রাণ আপামর জনসাধারণকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং দেশ ও জাতিকে বিদআত শিরকের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

হোসাইন আহমদ (জাবের)
জামিয়া কারিমিয়া আরাবিয়া, রামপুরা, ঢাকা।
১/১/২০১৪ইং

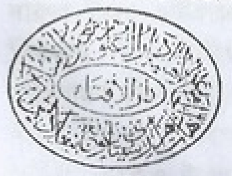
প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. এর শরয়ী বিধান সংক্রান্ত
ফাতওয়া নং-১৫৫৬
শিক্ষাবর্ষ-১৪৩৩-৩৪
ফাতওয়া বিভাগ
দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।



বরাবর,
প্রধান মুফতি সাহেব দা:বা:
ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রশ্ন:(১) প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. শরিয়ত সম্মত কি না? আশাা করি এ ব্যাপারে কুরআন হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির আলোকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।
প্রশ্ন:(২) যারা জশনে জুলুস ও ঈদে মীলাদুন্নবী সা. উদযাপন করে তারা তা কোন দলিলের ভিত্তিতে করে এবং তাদের দলিলগুলো কতটুকু নির্ভরযোগ্য? আশা করি এ ব্যাপারেও সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন।
প্রশ্ন:(৩) যারা জশনে জুলুসের আয়োজন করে এবং যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে ও যারা অংশগ্রহণ করে তাদের ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কি?

প্রশ্ন:(৪) ক. প্রচলিত কিয়াম ও মিলাদের শরয়ি হুকুম কি? প্রচলিত কিয়াম কখন চালু হয়?
খ. কোনো কোনো ইমাম সাহেব মিলাদ পড়েন কিন্তু কিয়াম করেন না। আবার কোনো কোনো ইমাম সাহেব মিলাদ কিয়াম উভয়টা করেন। অনেকে বলেন, তাদের পিছনে নামাজ আদায় করা জায়েয হবে না তা কতটুকু সঠিক?
প্রশ্ন:(৫) প্রচলিত মিলাদ কিয়ামের শুরুতে যে দুরুদ ও সালাম পড়া হয়, তা কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কি না? মিলাদ মাহফিলে হুজুর সা. উপস্থিত হওয়া অথবা অনুপস্থিত হয়ে অবলোকন করা তথা হাযির নাযিরের আকিদা রাখার শরয়ী বিধান কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।



আবেদনে :
জোবায়ের বিন জাকের
সিন্দুরপুর, দাগনভূঞাঁ, ফেনী

প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাঃ) এর শরয়ী বিধান

১নং প্রশ্ন = প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাঃ) শরিয়ত সম্মত কিনা? আশা করি এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির আলোকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

সমাধানঃ রবিউল আউয়াল মাসে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আমাদের দেশে "ঈদে মীলাদুন্নবী" পালিত হয়। বিশেষত: এ মাসের ১২তারিখে এক প্রকারের আনন্দ মিছিল বা শোভাযাত্রা বের করা হয়ে থাকে যাকে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলা হয়। ফার্সী ভাষায় জশনের অর্থ আনন্দ, জুলুসের অর্থ মিছিল বা শোভাযাত্রা, আর আরবি ভাষায় ঈদের আভিধানিক অর্থ "আনন্দের দিন"। মীলাদ শব্দের অর্থ জন্ম, আর আন্নবী বলতে আমাদের মহানবী সা. কে বুঝায়। সব মিলিয়ে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. এ অর্থ দাঁড়ায় মহানবী সা. এর জন্মানন্দের শোভাযাত্রা। এর বিধান হল, প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাঃ) শরিয়ত সম্মত নয় বরং শরিয়ত বহির্ভূত তথা বিদআত। শরিয়তের অন্যতম চারটি দলিল তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসের কোথাও এর আলোচনা আসেনি। কারণ রাসূল (সাঃ) এর নবুওয়াতের ২৩ বছর, খিলাফতে রাশেদার ৩০ বছর, একশত দশ হিজরী পর্যন্ত সাহাবীগণের যুগে, একশত সত্তর হিজরী পর্যন্ত তাবেঈনদের যুগে এবং প্রায় দুইশত বিশ হিজরী পর্যন্ত তাবে তাবেঈনদের যুগে, এমনিভাবে আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও বড় বড় মুহাদ্দিস গণের যুগে এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ফলে প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. বিদআতী বস্তু সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ বিদআত বলা হয়–

বিদআতের আভিধানিক সংজ্ঞা

بدعة (বিদআতুন) শব্দটি بدع (বিদউন) ধাতু থেকে নির্গত। শব্দের অর্থ হলো, পূর্ব থেকে কোন আকৃতি ব্যতিত নতুন কোন কিছু আবিস্কার করা। পবিত্র কুরআনে এসেছে– بديع السموات والأرض

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। সূরা বাকার - ১১৭

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পূর্ব কোন আকৃতি ছাড়াই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।

বিদআতের শরঈ সংজ্ঞা

১ নং : আল্লামা বরকবি রহ. বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় ইবাদতের এমন নতুন নতুন নিয়ম নীতি ও পদ্ধতিকে বিদআত বলা হয়, যা অধিক সাওয়াবের নিয়্যাতে নবি করিম সা., খোলাফায়ে রাশেদিন, তিন শ্রেষ্ঠ যুগের সলফে সালেহীন ও মুজতাহিদ ইমাম গণের পর উদ্ভাবন করা হয়েছে। রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরামের বরকতময় যুগে অনুকূল পরিবেশ ও কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা এ সকল কর্ম কথায়, কাজে, প্রকাশ্যে অথবা ইঙ্গিতে করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া,সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়, আল্লামা শাহ আমদ শফি দা. বা. রচিত পৃষ্ঠা ২০)

২ নং : البدع فى الأصل احداث امر لم يكن فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ঐ সমস্ত নবাবিস্কৃত ইবাদতকে বিদআত বলে যা রাসূল সা. এর যুগে ছিল না। (ওমদাতুল কারি শরহে বুখারি ৫/৩৫৬ মিরকাত - ১/২১৬)

৩ নং : قال الشافعى رحمه الله تعالى ما احدث مما يخالف الكتاب او السنة او الاثر او الاجماع فهو ضلال

কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈদের উক্তি এবং উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণের ঐক্যমত্যের পরিপন্থি প্রত্যেক নব আবিস্কৃত ইবাদতই বিদআত এবং তা পথভ্রষ্টতা। (মিরকাত ১/২১৬)

৪ নং: মুফতিয়ে আযম হিন্দ আল্লামা মুফতি কিফায়েতুল্লাহ রহ. বলেন, বিদআত বলা হয় ঐ সমস্ত কাজকে যা মূলত শরিয়ত দ্বারা

প্রমাণিত নয় এবং হুজুর সা., সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগে যার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এবং যা দ্বীন মনে করে করা হয় অথবা দ্বীন বহির্ভূত মনে করে ত্যাগ করা হয়। (তালিমুল ইসলাম ৪/২৭)

ইতিহাসের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী সা.

ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, ৬০৪ হিজরী মোতাবেক ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের মৌসল শহরে আবু সাইদ মোজাফফর উদ্দীন কওকরী ইবনে আরবল (মৃতঃ ৬৩০ হিঃ) নামক এক অপব্যয়ী বাদশাহ দেখল, তার পাশের দেশের খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা আ. এর জন্ম দিবস পালন করছে। তখন সে তাদের অনুসরণে মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম মীলাদুন্নবী নামক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঐ সময় তার সহযোগিতায় ছিল স্বার্থবাদী, প্রবৃত্তিপূজারী আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে দিহয়া (মৃতঃ৬৩৩হিঃ) নামক জনৈক দরবারী আলেম। ঐ অনুষ্ঠানে তিনটি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল (১) ১২ রবিউল আউয়ালের তারিখ নির্ধারণ (২) আলেম ওলামার ইজতেমা (৩) মাহফিল শেষে জিয়াফতের ব্যবস্থা।

মিলাদের রসম-প্রথা যখন চালু হলো, তখন এর জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া নিয়ে বিতর্কের সুত্রপাত হলো। সে যুগের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকিহানী রহ. ও তার মতাদর্শী ওলামায়ে কেরাম মীলাদের শর্ত-শরায়েত দেখে এতে যোগদান থেকে বিরত থাকেন এবং একে বিদআতে সাইয়্যেআ বলে অভিহিত করেন। অপর দিকে কিছু স্বার্থবাদী, প্রবৃত্তিপূজারী ও দরবারী আলেম বাদশাহর পক্ষ নিয়ে মীলাদকে জায়েজ ও মুস্তাহসান বলে ফতোয়া দেয় এবং বাদশাহ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। এভাবে এই রসম যখন সর্বত্র চালু হলো তখন তা ওলামায়ে কেরামের প্রাইভেট সম্মেলন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থেকে জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে এবং ক্রমশঃ অনেক নতুন নতুন বিষয় তার সাথে যুক্ত হতে লাগল। বৎসরের যে কোন সময় বরকতের উদ্দেশ্যে বা দোয়া কবুলের জন্য এক নতুন পদ্ধতিতে মীলাদ পড়া শুরু হলো। এক পর্যায়ে মীলাদুন্নবীর সাথে ঈদ যুক্ত হয়ে তা ঈদে মীলাদুন্নবীর রুপ নিল। অথচ রাসূল (সাঃ) উম্মতের জন্য সারা বছরে শুধু দু'টি দিনকেই ঈদের দিন রুপে ধার্য করেছেন। একটি ঈদুল ফিতর, অপরটি ঈদুল আজহা। যদি

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্মদিন ঈদের দিন হত তবে উম্মত কে তিনি অবশ্যই তা বলে যেতেন। কিংবা দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করা তার পছন্দ হলে সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন অবশ্যই এই শুভ প্রথা চালু করতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। না করার ফলে দু'কথার এক কথা অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে। হয়তো আমারা ভুলের উপর আছি, নতুবা বলতে হবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিলাদাতে (জন্মগ্রহণে) সাহাবায়ে কেরামরা আনন্দিত ছিলেন না, অথবা নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আমাদের যে হারে ভালোবাসা রয়েছে,তা তাদের ছিল না। (নাউযুবিল্লাহ)

যা হোক, ঈদ হলো একটি ইসলামী পরিভাষা। বছরের দু'টি দিনের উপর শব্দটি প্রযোজ্য, অন্য দিনের উপর শব্দটির মনগড়া প্রয়োগ ধর্মের বিকৃতি ছাড়া আর কি হতে পারে ? (এখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকীম-৬৫-৬৮)

মুসলমানের ঈদ দুইটি

হাদিস শরিফে এসেছে–

عن انس قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هتان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر(ابو داؤدج١ ص١٦١-المكتبة الاسلامية بنغلابازار داكا)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. মদীনায় এসে দেখলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম দুইটি দিনে তথা মেহেরজান ও নাইরোজে আনন্দ উল্লাস করছেন। তখন আল্লাহর নবী সা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এই দুইদিনে কি কর? সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগ থেকে এই দুইদিনে আনন্দ উল্লাস করে আসছি। তখন আল্লাহর নবী সা. সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আনন্দ উৎসবের জন্য এই দুইদিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দুইদিন দান করেছেন। একটি হল ঈদুল আযহা, অপরটি ঈদুল ফিতর। (আবু দাউদ১/১৬১)

বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ সহ হাদিসের সকল কিতাব এবং ফাতাওয়ায়ে শামি, বাযযাযিয়া, তাতারখানিয়া, আলমগিরি প্রভৃতি সকল ফাতাওয়ার কিতাবে باب العيدين ، كتاب العيدين শিরোনামে শুধুমাত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার বিধানাবলীই আলোচিত হয়েছে। ফিকহ্, হাদিস, ফতোয়াসহ চার মাযহাবের কোনো ইমাম থেকে ঈদে মীলাদুন্নবীকে তৃতীয় একটি ঈদ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতে ঈদ শব্দের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে-

قال الراغب العيد ما يعاود مرة بعد اخرى وخص فى الشريعة بيوم الفطر ويوم الاضحى.

ঈদ বলা হয়, যা একের পর এক প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে ঈদ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ভিতরই সীমাবদ্ধ। মিরকাত ৩/২৪৩

অনুরূপভাবে আল্লাহর নবি সা. ইরশাদ করেছেন-

لا تجعلوا قبرى عيدا

আমার কবরকে ঈদ বানাইওনা (আবু দাউদ ১/২৭৯, মুসনাদে আহমদ ৩/৫৭) এ হাদিসের একটি ব্যাখ্যা এমনও আছে যে, ঈদ যেমন বছরের নির্দিষ্ট দু'দিন উদযাপিত হয়, এভাবে আমার জেয়ারতকেও নির্দিষ্ট দু'একদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করবেনা। বরং যখনই সুযোগ হয়, তখনই যিয়ারত করবে। সূরায়ে মায়েদার আয়াত নং ৩ اليوم اكملت لكم دينكم الخ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইয়াহুদীরা হযরত ওমর রা. কে বলল, এ আয়াত যদি আমাদের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা অবতীর্ণ হওয়ার দিন তথা আরাফার দিনে ঈদ পালন করতাম। তখন ওমর রা. তাদের বললেন, আমাদের ঈদকে শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, অর্থাৎ ইসলামি শরিয়তে ঈদ মাত্র দু'টি (১) ঈদুল ফিতর (২) ঈদুল আযহা। এতে বৃদ্ধি করার অধিকার কারো নেই।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন হাদিসে জুমার দিনকে সপ্তাহের ঈদের দিন বলা হয়েছে, তা ঈদের আভিধানিক অর্থ তথা খুশির দিন হিসেবে বলা হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়। সুতরাং জুমার দিনের শাব্দিক ঈদকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে শরিয়তের দু'টি সীমাবদ্ধ পারিভাষিক ঈদের উপর আরো একটি ঈদ যোগ করা আদৌ সমচীন হবে না।

আমাদের আলোচনা চলছিলো ঈদে মীলাদুন্নবী সা. এর শরয়ী বিধান নিয়ে,

এখন ঐ ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে লক্ষ-কোটি টাকা অপব্যয় করে জশনে জুলুস ও শানদার মিছিলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর নিজেদেরকে সুন্নী বলে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ এসবের একটিও আল্লাহর নবী সা., সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হক্কানী ওলামাদের কেউ করেননি। অতএব এটা যে একটি ঘৃণ্য বিদআত তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। হাদিসের আলোকে আপনার সমস্যার শরয়ী সমাধান, (মুফতি আযম আল্লামা আবদুস সালাম চাটগামী দা.বা. প্রণীত) ১/১৫৮, কেফায়েতুল মুফতি ১/১৪৭, ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া ১/১১৪।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مشكوة ص٢٧

যে ব্যক্তি আমার এই শরীয়তে কোন নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাবে, যা শরীয়তের অন্তর্গত নয়, তা পরিত্যাজ্য।

অন্য হাদিসে আছে-

من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ اياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مشكوة ص٣٠

আমার পর যারা জীবিত থাকবে তারা বহুতর বিভেদ দেখতে পাবে তখন তোমরা আমার সুন্নাত কে শক্ত হাতে ধারণ করবে, আমার পর হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কে ধারণ করবে এবং দন্ত যোগে আঁকড়িয়ে ধরবে। আর সাবধান! নবাবিস্কৃত কাজ সমূহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নবাবিস্কৃত কাজ বিদআত আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।

ইজমায়ে উম্মতের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
হানাফী মাশায়েখগণের মতামত

(১) আবদুর রহমান মাগরিবি (রহ.) তাঁর ফাতাওয়ার মধ্যে লিখেনঃ

ان عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والأئمة (كذا فى الشرعة الالهية – ١٧٧، المدخل لابن ال–اج ج – ٢، ص – ١٠)

প্রচলিত মিলাদ মাহ্ফিল একটি বিদআত কাজ, যা রাসূল সা., খোলাফায়ে রাশেদীন এবং আইম্মায়ে মোজতাহিদীন কেউ করেননি এবং অপরকে করার জন্য নির্দেশও দেননি। (আশ্শারআতুল ইলাহিয়্যা- ১৭৭, মাদখাল খণ্ড-২, পৃঃ ১০)

আল্লামা শামী রহ. তাঁর বিখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ "রদ্দুল মুহতারে" লিখেন–

جرت عادة كثير من المحبين اذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله عليه وسلم ان يقوموا تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهذا القيام بدعة لااصل له

وفى موضع اخر: اقبح منه النذرة بقراءة المولد فى المنائر مع اشتماله على الغناء واللعب وايهاب ثواب ذلك الى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনেক প্রেমিকদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, তারা যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে পায় তখন তারা তা'জীমের জন্য দাঁড়িয়ে যায় অথচ এই দাঁড়ানো বিদআত, এর কোন ভিত্তি নেই।

অন্যত্র আরো বলেন– মীলাদ পাঠের মান্নত করা হচ্ছে একটি জঘন্যতম কাজ ....।

(৩) কাজী শেহাবুদ্দীন (রহ.) তার ফাতাওয়ায় লিখেন–

سئل القاضى عن مجلس المولد الشريف قال لاينعقد لأنه محدث وكل محدث ضلالة وكل ضلالة فى النار ومايفعلون من الجهال على رأس كل حول فى شهر

الربيع الاول ليس بشيى ويقومون عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ويزعمون ان روحه صلى الله عليه وسلم يجيى وحاضر فزعمهم باطل بل هذا الاعتقاد شرك وقد منع الأئمة الأربعة عن مثل هذا. (الجنة لأهل السنة — ١٧٧)

কাজী সাহেবকে প্রচলিত মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, মিলাদ অনুষ্ঠান জায়েয নেই। কারণ ইহা একটি নতুন কাজ হিসাবে বিদ্আত, আর প্রত্যেক বিদআত কাজই গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামী হবে। প্রত্যেক বছরের শুরুতে রবিউল আউয়াল মাসে কতিপয় মূর্খ প্রকৃতির লোক মিলাদের নামে যে অনুষ্ঠান করে থাকে শরীয়তে তার কোন অস্তিত্ব নেই। তারা রাসূলে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম মুবারক উচ্চারণ করার সময় দাড়িয়ে যায় আর উক্ত মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র রূহ মুবারক উপস্থিত হয় বলে বিশ্বাস করে, অথচ তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং এ জাতীয় বিশ্বাস রাখা শিরক। চার মাযহাবের ইমামগণ এ জাতীয় কাজ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন। (আলজুন্নাহ লিআহ্লিস্সুন্নাহ- ১৭৭)

(৪) আল্লামা হাসান ইবনু আলী (রহ.) তরিকাতুস সুন্নাহ কিতাবে লিখেন-

وما احدثته الصوفية الجهلة من مجلس المولد فى شهر الربيع الاول لا اصل له فى الشرع بل هو بدعة مذمومة الخ (الجنة لأهل السنة — ١٧٨)

রবীউল আউয়াল মাসে কতিপয় মূর্খ প্রকৃতির ছূফীরা প্রচলিত মিলাদের নামে যে অনুষ্ঠান করে থাকে শরীয়তে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ইহা একটি ঘৃণিত বিদআত কাজ। (আলজুন্নাহ লিআহ্লিস্ সুন্নাহ ১৭৮)

(৫) হাফেজ আবু বকর বাগদাদী (রহ.) লিখেন-

حافظ ابوبكر بغدادى الشهير بابن نقطه رح ابنى فتاوى مى لكتهى هى : ان عمل المولد لم ينقلب عن السلف ولاخير فى مالم يعمل السلف (الجنة لأهل السنة — ١٧٨)

প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সলফ থেকে কোন প্রকার বর্ণনা নেই। আর সলফ যে আমল করেননি, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই।

(৬) মাওলানা ফজলুল্লাহ জৈনপুরী (রহ.) বলেন-

علامه فضل الله جونپوری رح بهجة العشاق می فرماتی هی

নবী করিম সা.এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাহিনী শুনবার সময় সাধারণ মানুষ যে কেয়াম করে তার কোন দলীল নেই বরং তা মাকরুহ।

(৭) কাযী নাসির উদ্দীন গুজরাটি রহ. লিখেছেন-

قاضی نصیر الدین گزرتی رح طریقة السلف می فرما تی هی وقد احدث بعض جهال المشایخ امورا کثیرة لا نجد لها اثرا ولا رسما فی کتاب ولا سنة منها القیام عند تکر ولادة سید الأنام علیه التحیة والسلام (الجنة لأهل السنة – ١٧٨)

কিছু সংখ্যক জাহিল পীর অনেক এমন বিদআত চালু করেছেন, যার সমর্থনে কোন হাদীস বা কোন নীতি কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলে কারিম সা. এর জন্ম বৃত্তান্ত বলার সময় দাড়ানো। (আলজুন্নাহ লিআহ্‌লিস সুন্নাহ- ১৭৮)

(৮) ইমামুল হিন্দ হযরত শায়খ আহমদ সারহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী হানাফী (মৃতঃ ১০৩৪ হিঃ) মাকতুবাতে লিখেন-

بنظر انصاف به بینید که اگر فرضا حضرت ایشاں دریں آوان در دنیا زنده میبود واین مجلس واجتماع منعقد میشود ابایں امر راضی میشدند واین اجتماع را می پسندید یا نه یقین فقیر أنست که هرگز این معنی راتجویز نمیفرمود بلکه انکار مینودند مقصود فقیر اعلام بود قبول کنید یا نه کنید هیچ مضانقة نیست ..... والسلام اولا وأخیرا – مکتوبات ربانی دفتر اول حصه پنجم (مکتوب دویست و هفتاد دوسم – ٢٧٣)

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী এ বিষয়ে তার মুরশিদ খাজা বাকী বিল্লাহ রহ. সম্পর্কে লিখেন, ‘ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখা উচিত যে, আজ যদি হযরত নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃথিবীতে জীবিত থাকতেন এবং ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে এসব অনুষ্ঠান ও সমাবেশ দেখতেন, তাহলে কি তিনি তাতে সন্তুষ্ট হতেন। এবং এসব সমাবেশের কি তিনি অনুমোদন দিতেন? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, এসব কিছুকেই তিনি অনুমোদন দিতেন না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সত্য কথা তুলে

ধরা, কেউ গ্রহণ করা না করা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। (দপ্তরে আউয়াল, মাকতুব- ২৭৩)

(৯) শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.(মৃতঃ ১২৩৯ হিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল–

প্রশ্নঃ রবিউল আউয়াল মাসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে এর সাওয়াব হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রূহ মোবারকে পৌছানো তেমনি মুহাররম মাসে হযরত হুসাইন ও অন্যান্য আহলে বাইতের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা-পিনার আয়োজন করা কি জায়েজ আছে?

উত্তরে তিনি বলেনঃ নিজের আমলের সাওয়াব কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বখশিশ করার ইখতিয়ার মানুষের আছে। তবে এর জন্য কোন মাস বা দিনকাল নির্দিষ্ট করা বিদআত .....। (ফাতাওয়ায়ে আজীজী পৃঃ ১৯৯) আর তিনি 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যা' কিতাবে মীলাদ উদযাপনকে শিয়াদের মুহার্‌রম উদযাপনের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন "শিয়াদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।"

(১০) যখিরাতুস্ সালেকীনে উল্লেখ আছে–

زخیرة السالکین میی هی که نام آں مولودی نامند از بدعتست چه رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچکس را بدین نفرموده است ونه خلفاء اور ائمه ونه خود یان فعل کردنه اند (الجنة لأهل السنة — ۱۷۸)

প্রচলিত মীলাদ মাহ্ফিল একটি বিদআত কাজ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোলাফায়ে রাশেদীন এবং আইম্মায়ে মোজতাহেদীন ইহা করেননি। (আলজুন্নাহ লিআহ্‌লিস্ সুন্নাহ- ১৭৮)

মালেকী মাশায়েখগণের মতামত

(১) আল্লামা তাজুদ্দিন ফাকেহানি (রহ.) লিখেন–

لاعلم هذا المولد اصلا فى كتاب ولاسنة ولاينقل عمله من احد من العلماء الأئمة الذين هم القدوة فى الدين.المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون بدليل انا اردنا عليها الاحكام الخمسة قلنا ان يكون واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها او محرما ليس بواجب اجماعا ولا مندوبا لان حقيقة المندوب ماطلبه الشرع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشرع ولافعله الصحابة والتابعين المتدينون فيما عملت هذا جوابي عنه بين يدى الله عزوجل ان عنه سئلت ولاجائزا ان يكون مباحا لان الابتداع فى الدين ليس مباحا باجماع المسلمين فلم يبق الا ان يكون مكروها او حراما (الجنة لأهل السنة – ١٧٦)

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে প্রচলিত মীলাদের কোন ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই এবং আইম্মাগণ থেকেও তার কোন বর্ণনা নেই। যারা ছিলেন শরীয়তের আদর্শ ও নমুনা, পূর্ববর্তীগণের আদর্শকে তারাই মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ইহা একটি বিদআত কাজ যা প্রবৃত্ত পূজারি বাতেলপন্থী দলের লোকেরাই আবিষ্কার করেছিল অসার দলীল উপস্থাপনের মাধ্যমে। কিন্তু শরীয়তের পাঁচ প্রকার বিধানের আওতাভুক্ত করে পরীক্ষা করলেই তার অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই কাজটি ওয়াজিব,

মোস্তাহাব, জায়েজ, মাকরূহ ও হারাম থেকে যে কোন একটি অবশ্যই হবে। সর্বসম্মতিক্রমে ইহা ওয়াজিব নয়। আবার মোস্তাহাবও নয়, কেননা মোস্তাহাব কাজের তাৎপর্য হল যাকে শরীয়ত করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু তা পরিত্যাগ করলে তিরস্কার করা হয় না। আমরা জানি যে,উক্ত কাজটির ব্যাপারে শরীয়তের কোন নির্দেশ নেই এবং সাহাবা রা. তাবেঈন রহ. থেকে কেউ ইহা করেননি। মোবাহও নয়। কারণ, ধর্মে নব আবিষ্কৃত কোন কাজ মুবাহ হতে পারে না, একথার উপর সকল উম্মত একমত। এখন

মাকরূহ এবং হারাম বাকী আছে। অতএব এ অনুষ্ঠান হয়তো হারাম হবে না হয় মাকরূহ হবে। (আলজুন্নাহ্ লিআহ্লিস্ সুন্নাহ- ১৭৬)

নোটঃ আল্লামা তাজুদ্দিন ফাকেহানি রহ. ছিলেন মীলাদ উদ্ভাবন কালের একজন প্রসিদ্ধ আলেম। তিনি মীলাদের প্রতিবাদে এক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছিলেন। কিতাবের নাম المورد فى الكلام على عمل المولد 'আল-মাউরিদ ফিল কালামি আলা আমালিল মাওলিদ' উক্ত কিতাবেও তিনি এই ইবারত লিখেন।

(২) মালেকী মাযহাবের ইমাম আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ মাদ্খালের মধ্যে বলেন–

ومن جملة مااحدثوه من البدع من اعتقادهم ان تلك من اكبر العبادات واظهار الشعائر مايفعلونه فى الشهر الربيع الاول من المولد وقد احتواى تلك على بدع ومحرمات الى .... ان قال وهذه المفاسد مترتبة على فعل المولد اذا عمل بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا اليه الاخوان ومسلم من كل تقدم تكره فهو بدع بنفس نيته فقط لأن تلك زيادة فى الدين ليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف اولى بل اوجب من ان يزيد فيه مخالفة لما كانوا عليه لأنهم اشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم ولهم قدم السبق فى المبادرة الى تلك ولم ينقل عن احد منهم انه نوى المولد ونحن لهم تبع. المدخل لابن الحاج ج – ٢، ص ١ ...١١)

মানুষ যে সমস্ত নতুন বিদআত আবিস্কার করেছে তার মধ্যে যাকে তারা বড় ইবাদত মনে করে এবং শরীয়তের নিদর্শন বলে প্রকাশ করে, তা হলো মিলাদ মাহফিল। তারা রবিউল আউয়াল মাসেই এই উৎসবটি করে থাকে। এ ব্যাপারে বাস্তব কথা হল, ইহা একটি বিদ্আত কাজ। তিনি আরও বলেন, ঐ অনুষ্ঠানের অন্যতম খারাপ দিক হল, তার মধ্যে ছেমা (গান বাদ্য) হয়। আর কখনো মিলাদ মাহফিল ছেমা থেকে পবিত্র থাকলেও মিলাদের নিয়্যাতে খানা তৈরী করা এবং আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ করাটা মিলাদের নিয়্যাতের কারণে বিদআত হবে। কেননা এটা ধর্মের মাঝে এক নতুন কাজের উদ্ভাবন যা সলফে সালেহীনের যামানায়

ছিল না, অথচ সলফে সালেহীনের পদাংক অনুসরণ করা এবং তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। কারণ তারাই ছিলেন বাস্তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুসারী ও প্রেমিক, অথচ তাদের থেকে কেউ এ অনুষ্ঠান করেননি। অতএব আমরা তাদেরই অনুসরণ করব। অর্থাৎ এ সব অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকব। (মাদ্খাল ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১)

(৩) আহমদ বিন মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী লিখেন-

قد اتفق المذاهب الاربعة بذم هذا العمل – القول المعتمد. (الجنة لأهل السنة)

চার মাযহাবের আলেমগণ মীলাদ অনুষ্ঠানের নিন্দায় একমত। (আল ক্বাউলুল মু'তামদ, আলজুন্নাহ লিআহলিস্ সুন্নাহ, আল মিনহাজুল ওয়াজেহা পৃঃ ২৫৩)

(৪) আবুল হাসান আলী ইবনুল ফজল মুকাদ্দেসী মালেকী (রহ.) جامع المسائل (জামেয়ুল মাসায়েল) এর মধ্যে প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীকে বিদআত বলেছেন। (আলজুন্নাহ লিআহলিস সুন্নাহ- ১৭৭)

শাফেঈ মাশায়েখগণের মতামত

(১) মাওলানা নাসির উদ্দীন আল-আওদী শাফিঈ মীলাদ সম্পর্কীয় এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–

لايفعل لانه لم ينقل عن السلف الصالح وانما احدث بعد القرون الثلاثة فى الزمان الطالحونحن لانتبع الخلف فى ما اهمل السلف لانه يكفى بهم الاتباع فاى حاجة الى الابتداع. (الجنة لأهل السنة)

মীলাদ পাঠের অনুষ্ঠান করা যাবে না। কারণ সলফে সালেহীন থেকে কেউ এমন অনুষ্ঠান করেননি। তিন শ্রেষ্ঠ যুগের পর এক খারাপ যুগের লোকেরা এ অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করেছে। যে কাজ সলফে সালেহীন করেননি, সে কাজের ব্যাপারে আমরা পরবর্তীকালের লোকদের অনুসরণ করব না। কেননা সলফে সালেহীনের অনুসরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ বিদআত কাজ করার কি প্রয়োজন? (আলজুন্নাহ লিআহ্‌লিস্‌সুন্নাহ)

(২) হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.(মৃতঃ ৮৫২ হিঃ)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল মীলাদ অনুষ্ঠান কি বিদআত? না শরীয়তে এর কোন ভিত্তি আছে?

জবাবে তিনি বলেন, "মিলাদ অনুষ্ঠান মূলতঃ বিদআত। পবিত্র তিন যুগে, সালফে সালেহীনের যুগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। (হিওয়ার মা'আল মালেকী পৃঃ ১৭৭)

(৩) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেঈ (রহ.) (মৃতঃ ৯১১ হিঃ) লিখেন–

ليس فيه نص ولكن فيه قياس – حسن المقصد فى عمل المولد. (راه سنت)

অর্থাৎ উক্ত কাজ শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে অনুমান ব্যতীত কুরআন হাদিসের কোন প্রমাণ নেই। (রাহে সুন্নাত)

হাম্বলী মাশায়েখগণের মতামত

হাম্বলী মাযহাবের শায়খ শরফুদ্দীন (রহ.) লিখেন–

ان ما يعمل بعض الأمراء فى كل سنة احتفالا لمولده صلى الله عليه وسلم مع اشتماله على التكلفات الشنيعة بنفسه بدعة احدث من يتبع هواه ولايعلم ماامره صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة ونهاه. (الجنة لأهل السنة – ١٧٧)

প্রতি বছর কিছু (ধর্মান্ধ) আমীর প্রকৃতির লোকেরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের নামে যে অনুষ্ঠান করে থাকে ইহা প্রকৃতগতভাবেই একটি বিদআত কাজ যাকে আবিস্কার করছিল প্রবিত্ত পূজারীরা, তারা সাহেবে শরীয়ত তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশ নিষেধ কিছুই বুঝে না। (আলজুন্নাহ লিআহ্‌লিস্ সুন্নাহ- ১৭৭)

ঈদে মীলাদুন্নবী ও কিয়াস

এ অনুষ্ঠান বিদআত হওয়ার পক্ষে যেহেতু মুজতাহিদগণের প্রকাশ্য বক্তব্য রয়েছে, তাই আমরা কিয়াসের শরণাপন্ন হব না। কারণ কিয়াসের শরণাপন্ন তো তখনই হতে হয় যখন পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের কোন বক্তব্য না থাকে।

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারক ও তার জীবনবৃত্তান্ত

৬০৪ হিজরিতে মৌসল শহরে মোজাফ্ফর উদ্দীন কওকারী ইবনে আরবল (মৃত ৬৩০ হিঃ) নামক এক অপব্যয়ী বাদশাহ সর্বপ্রথম এই মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান করেছিল। তার সহযোগিতায় ছিল স্বার্থবাদী, প্রবিত্ত পূজারী মৌলভী আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে দিহয়া (মৃতঃ ৬৩৩ হিঃ)।

(১) ইমাম আহমদ ইবনে মোহাম্মদ বসরি মালেকী (রহ.) লিখেন–

كان ملكا مسرفا يأمر علماء زمانه ان يعملوا باستنباطهم واجتهادهم وان لا يتبعوا المذهب غيرهم حتى مالت اليه جماعة من العلماء وطائفة من الفضلاء ويحتفل لمولده صلى الله عليه وسلم فى ربيع الاول وهو اول من احدث من الملوك هذا العمل (ابن خلكان)

সে ছিল এক অপচয়ী বাদশাহ্। তার সমকালীন আলেমগণকে তাদের ইজতেহাদ ও ইস্তেমবাত (গবেষণা) অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিত। মাযহাবকে অমান্য করার নির্দেশ দিত। এই অবস্থায় কিছু স্বার্থান্বেষী ওলামা ও ফুজালার একটি দল তার প্রলোভনে আটকে পড়ে। তার কথা মত রবিউল আউয়াল মাসে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান শুরু করেছিল। সেই সর্ব প্রথম এই বিদআত আবিস্কার করে ছিল। (ইবনে খল্লিকান)

(২) তার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কসীর (রহ.) লিখেন–

فى البداية والنهاية — وكان يعمل المولد الشريف فى ربيع الاول ويحتفل به احتفالا هائلا وكان مع ذلك سهما شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله واكرمه مثواه وقد صنف الشيخ ابوالخطاب ابن دحية له مجلدا فى المولد النبوى سماه "التنوير فى مولد البشير النذير" فاجازه على تلك بالف دينار — وقد طالت مدته فى الملك فى زمان الدولة الصلاحية وقد كان محاصر عكا والى هذه السنة محمود السيرة والسريرة قال السبط : حكى بعض من حضر سماط المظفر فى بعض الموالد كان يمد فى ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوى وعشرة ألاف دجاجة ومائة الف زبدة وثلاثين الف صحن حلوى قال : وكان يحضر عنده فى المولد اعيان العلماء الصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعا من الظهر الى الفجر ويرقص بنفسه معهم وكانت له دار ضيافة للوافدين من اى جهة على صفة وكانت صدقاته فى جميع القرب الطاعات على الحرمين وغير الخ ....

١٩٥/١٣/ ابن خلكان ١١٧/٤ — ١١٩)

সারসংক্ষেপ ঃ সে রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মীলাদ মাহ্ফিলের বৈধতা ব্যাখ্যা করে আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে দিহয়া (মৃতঃ ৬৩৩ হিঃ) التنوير فى مولد البشير والنذير (আত্-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশিরিন নাজীর) নামক একটি কিতাব লেখে, ফলে ঐ বাদশাহ তাকে এক হাজার দিনার পুরস্কার প্রদান করে।

ঐ বাদশাহর কোন কোন ঈদে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার ভুনা মাথা, দশ হাজার মুরগী এবং ত্রিশ হাজার হালুয়ার পাত্র থাকত। অনুষ্ঠানস্থলে স্থাপন করা হত বিশ এর অধিক চার/পাঁচ তলা বিশিষ্ট গম্বুজ। তন্মধ্যে একটি গম্বুজ বাদশাহর জন্যে নির্দিষ্ট থাকত। অবশিষ্ট গম্বুজগুলোতে অবস্থান করত বাদশাহর আমলা-মন্ত্রীরা। সফর মাস থেকেই শুরু হত গম্বুজ সাজানোর কাজ। অনুষ্ঠানে অত্যন্ত ধুম ধামের সাথে নাচ-গানের আসর বসত। বাদশাহ নিজেও নাচ-গানে শরীক হত। অনুষ্ঠান শেষে যোগদানকারীদের যথাযোগ্য সম্মানীও দেয়া হত। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩/১৫৯ তারীখে ইবনে খল্লিকান- ৪/১১৭, ১১৯)

(৩) আল্লামা জাহাবী শাফেঈ (রহ.) মৃতঃ ৭৪৮ হি. লিখেন-

كان ينفق كل سنة على مولد النبى صلى الله عليه وسلم نحو ثلاث مائة الف

(دول الاسلام ١/١٠٢، البداية والنهاية ١٥٩/١٣)

সে প্রতিবছর মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ টাকা খরচ করত (দুওালুল ইসলাম- ১/১০২, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩/১৫৯ পৃঃ)

বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে দিহয়া

(১) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

فى لسان الميزان — كثير الوقيعة فى الأئمة وفى السلف من العلماء وخبيث اللسان

احمق شديد الكبر قليل النظر فى امور الدين متهاونا ٢٩٦/٤

সে পূর্ববর্তী ইমাম ও আলেম-উলামাদের সাথে বেয়াদবী করত, সে ছিল অশ্লীল ভাষী, অহংকারী, নির্বোধ এবং দ্বীন সম্পর্কে সংকীর্ণমনা ও অলস। (লিসানুল মিজান ৪/২৯৬ পৃঃ)

(২) তিনি আরও বলেন ঃ

رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه (لسان الميزان ٢٩٥/٤)

আমি এই মৌলভী সাহেবের মিথ্যাচার ও অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে লোকদেরকে একমত দেখেছি। (লিসানুল মিজান ৪/২৯৫ পৃঃ)

(৩) তারিখে মিলাদ নামক কিতাবে আবুল খাত্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বর্ণিত হয়েছে, এপর্যন্ত আবুল খাত্তাব সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করা হলো, তাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সে ছিল

একজন গায়রে মুকাল্লিদ, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে অভিযুক্ত। মুজতাহিদ ইমাম, আলিম-উলামা এবং সলফে সালেহিনের বিষয়ে অশ্লীল মন্তব্যকারী। ধর্মীয় কাজে তার মাঝে প্রচন্ড রকমের শৈথিল্য ছিল। সে জাল হাদিস তৈরী করত। ব্যক্তিগত মতে সে ফতোয়া দিত। সে ছিল অহঙ্কারী ও মিথ্যুক। সূত্র: তারিখে মিলাদ পৃ:৩১-৩৫

(৪) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেন, সে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। আহলে জাহেরের অর্ন্তভূক্ত ছিল। (তারিখে মীলাদ-৩৬)।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনি অবশ্যই অবলোক করেছেন যে, প্রচলিত মিলাদ মাহ্‌ফিলের আবিষ্কারক ও প্রচলনকারী কে ছিল?

এখন আপনিই চিন্তা করে বলুন "খাইরুল কুরুন" (তথা সাহাবা রা., তাবেঈন, তাবে তাবেঈন রহ, গণের) অনুসরণ করবেন? না কি অপব্যয়ী বাদশাহ ও ধোঁকাবাজ মৌলভী সাহেবের অনুসরণ করবেন? আল্লাহ সবাইকে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন, আমিন।

ঈদে মীলাদুন্নবীর নিন্দনীয় দিকসমূহ

(১) মিলাদ সমর্থক আলেমগন কেবল নিজেরা যে ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান করেন তা নয়, বরং যারা এসব অনুষ্ঠান করে না তাদেরকে ওহাবী, রাসূলের "শত্রু" বলেও গালীগালাজ করা হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হায় আফসোস ! তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে যে, তাদের নিজেদের আবিস্কৃত ইসলামের এই নিদর্শন(?) হতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল মুসলমান "বঞ্চিত"(?) ছিলেন, তাদের সম্পর্কে কী বলা হবে? তারা সবাই কি নাউযুবিল্লাহ রাসূলের শত্রু ছিলেন? তাছাড়া তারা যদি এ বিষয়েও চিন্তা করত যে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা তো বিদায় হজে আরাফার ময়দানে হয়ে গেছে। এরপর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে? যিনি এমন একটি কাজকে ইসলামের বিশেষ নিদর্শন নির্ণয় করেছেন। যার সাথে প্রথম ছয় শতাব্দীর সকল মুসলমান ছিলেন অপরিচিত। ইসলাম কি আমার আপনার পৈতৃক সম্পত্তি যে, যখন ইচ্ছা এর কিছু অংশ রহিত করে দিবে এবং যখন ইচ্ছা এর সাথে কিছু জিনিস সংযোজন করে দিবে।

(২) তাদের ধারণা যে, রাসূল সা. এ মাহফিলে হাজির হন। অর্থাৎ তারা রাসূল সা. কে হাযির নাজির মনে করে। অথচ শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দিক দিয়ে এধরণের আকিদা অসত্য ও শিরকি। কারণ হাযির নাজির হওয়া একমাত্র আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ যা অন্য কারো জন্য হতে পারে না। (বিস্তারিত সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ)

বিধর্মীদের অনুসরণ

(৩) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের অন্যতম নিন্দনীয় দিক হল, এর দ্বারা অন্যান্য ধর্মালম্বীদের সাদৃশ্যতা এবং তাদের অনুকরণ পাওয়া যায়, যা হাদিসের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

" যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে সে ঐ সম্প্রদায়ের বলে গণ্য হবে। আবু দাউদ ২/৫৫৯

মুসলিম সমাজে নবির জন্ম দিবস পালন করার প্রথা খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের থেকে এসেছে। খ্রিষ্টানরা প্রতি বছর ২৫ শে ডিসেম্বর হযরত ঈসা আ. এর জন্ম দিবস পালন উপলক্ষে (Ehristmas Day) তথা যীশু খৃষ্টের জন্ম দিবস এর আয়োজন করে থাকে। হিন্দুরা প্রতি বছর ৮ ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিবস উপলক্ষে জন্মাষ্টমী পালন করে থাকে। এ উপলক্ষে বিশাল জুলুস মিছিলের আয়োজন করে থাকে। অতএব মুসলমানদের জন্য এমন অনুষ্ঠান উদযাপন করা নাজায়িজ ও হারাম।

ইসলামে জন্মদিবস ও মৃত্যু দিবস পালন অবৈধ

(৪) প্রাক-ইসলামি যুগে মানুষের মাঝে নিজেদের মহাপুরুষ ও ধর্ম প্রবর্তকদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের প্রথা ছিল। যেমন খ্রিস্টান বিশ্ব অদ্যাবধি হযরত ঈসা আ. এর জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে 'ক্রিসমাস্ ডে' পালন করে। এর বিপরীত ইসলাম বার্ষিকী পালনের প্রথা বন্ধ করে দিয়েছে। এতে দু'টি হিকমত(রহস্য) নিহিত রয়েছে (১) উক্ত দিবস পালনে যা কিছু করা হয়, ইসলামের দাওয়াত ও প্রাণ-প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম এসব বাহ্যিক সাজ-সজ্জা, রং-তামাশা ও স্লোগান সমর্থন করে না। ইসলাম এসব হৈ চৈ ও হট্টগোল থেকে দূরে অবস্থান করে নিজ দাওয়াতের সূচনা অন্তরের পরিবর্তন সাধন থেকে শুরু

করে। ইসলাম সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও নেক আমলের তরবিয়তের (প্রশিক্ষণ) মাধ্যমে মানুষ তৈরীর কাজ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব বাহ্যিক জাক-জমকের একটি কানা পয়সার ও মূল্য নেই। (২) দ্বিতীয় হিকমত হলো, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কোন বিশেষ মৌসুমে পল্লবিত হয় না, বরং ইসলাম তো সদা বসন্তের এমন উত্তম বৃক্ষ, যার ফল ও ছায়া সর্বদা বিরাজমান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের اكلها دائم و ظلها (তার ফল-মুল ও ছায়া চিরস্থায়ী। সূরা রাদ-২৫) বলা যথার্থ। ইসলামের দাওয়াত ও বার্তা কোন বিশেষ দিন-তারিখের অনুগ্রহের কাছে বন্ধক নয়। বরং তা সর্বব্যাপী ও প্রতি মুহূর্তের, বস্তুত এসকল বিষয় যেহেতু ইসলামের দাওয়াত ও প্রকৃতির পরিপন্থি, তাই প্রিয় নবি সা. সাহাবা ও তাবেঈনের পর দীর্ঘ ৬ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানগন তা কল্পনাও করেন নি। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভী রহ. লিখেন,পৃথিবীতে কেউ জন্ম নিবে আবার কেউ পৃথিবী ছেড়ে চলে যা, এটাই চিরচারিত নিয়ম। কারো আশা যাওয়ার দিন তারিখকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে জিইয়ে রাখার কোন বিধান ইসলামে নহে। চাই তিনি নবি রাসূল হোন না কেন। এসব অনুষ্ঠান ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি প্রিয় নবি সা. এর জন্ম বার্ষিকী পালন করাও শরিয়তে নিষেধ। এধরনের উৎসব পালন প্রিয় নবি সা. এর যুগে ছিল না। তাবেঈন তাবে তাবেঈনের যুগে ও ছিল না।

সুতরাং এটা গর্হিত ও বিদআত। ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/২৯৯

১২ রবিউল আউয়াল আনন্দ দিবস না শোক দিবস?

(৫) প্রিয় নবি সা. এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে কারো মতে ১লা রবিউল আউয়াল কারো মতে ২.৪.৭.৮.৯.১২ সহ বিভিন্ন মত রয়েছে। কিফায়াতুল মুফতি ২/১২৮। আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রহ. লিখেন, নবি করিম সা. ৮ রবিউল আউয়াল জন্ম গ্রহন করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং জুবাইর ইবনে মুতঈম রা. হতে এ তারিখই বর্ণিত হয়েছে এবং প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা কুতুবুদ্দিন কাসতালানি রহ. ও এ মতটি পছন্দ করেছেন। (সীরাতুল মুস্তাফা ১/৬৯ বাংলা সুত্রে যুরকানি ১/১৩১)

কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসিনের মত হল, আল্লাহর নবি সা. ১২ রবিউল আউয়ালেই ইন্তিকাল করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন মতবিরোধ নেই। আমরা যেন জশনে জুলুস তথা আনন্দ মিছিলের জন্য ঐ দিনকেই ধার্য করলাম, যেদিন নবিজি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এখন যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, তোমরা জশনে জুলুস তোমাদের নবির পবিত্র জন্মকে কেন্দ্র করে কর, না তার ইন্তিকালের আনন্দে? (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে হয়তো সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

রাসুল সা. এর জন্ম দিবস কি চায় ঈদ পালন না সওম সাধন?

(৬) নিঃসন্দেহে নবিজি সা. এর জন্ম বিশ্ববাসীর জন্য এক বড় নিয়ামত ও আনন্দের বিষয়। এখন জানার বিষয় হল, এ আনন্দের দিনটিকে মানুষ কিভাবে পালন করবে? যারা ঈমান আনেনি, রাসূল সা. এর আনুগত্য স্বীকার করেনি তাদেরকে নিয়ে তো কোন কথা নেই। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে সর্বক্ষেত্রে রাসূল সা. এর আনুগত্য স্বীকার করেছে, তাদের জন্য করণীয় হলো এক্ষেত্রে রাসূল সা. কি করেছেন বা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা।

عن ابى قتاده الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذالك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل على فيه

হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী রা. বলেন, রাসূল সা. কে সোমবারের রোযা রাখা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এদিনেই আমি জন্ম লাভ করি এবং এদিনেই আমার উপর ওহী অবতীর্ণ করা হয়। মুসলিম শরিফ ১/৩৬৮।

এই হাদিস এবং এরূপ আরো অনেক সহিহ হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল সা. জন্ম দিনের শুকরিয়া পালনার্থে সোমবারে রোজা রাখতেন।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হকী ৪/২৮৬ তারিখে দিমাশক ৩/৬৬)

অতএব কোন মুসলমান যদি সত্যিকার অর্থে আশেকে রাসূল ও নবি প্রেমিক হতে চান এবং রাসুল সা. এর জন্মের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে চান, তার করণীয় হল, রাসূল সা. এর অনুসরণে সোমবারে রোজা রাখা। তা না

করে যদি কেউ শুধু মাত্র বছরে একবার ১২ রবিউল আউয়ালে রাসূল সা. এর জন্ম দিবস পালন করে, তাও আবার রোজার পরিবর্তে ঈদ পালন করে। তবে তা রাসূল সা. এর শানে চরম গোসতাখী ও বেআদবি বলে গণ্য হবে। যা কোন আশেকে রাসূল তো দূরের কথা কোন সাধারণ মুসলমানও করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

ঢাক ঢোল বাজিয়ে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা আবু লাহাবের কাণ্ডকীর্তি বৈ কিছু নয়

(৭) নবি করিম সা. এর জন্ম দিনকে কেন্দ্র করে আনন্দ প্রকাশ করাকেই যদি ঈদে মীলাদুন্নবী বলা হয়, আর এটা করেও যদি নবির আদর্শ বর্জন করা হয়, তাহলে এ বীভৎস রূপরেখার ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথম উদযাপনকারী বলতে হবে আবু লাহাবকে।কারণ সে নবি করিম সা. এর জন্ম দিবসে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের বাদীকে চিরকালের জন্য আজাদ (স্বাধীন) করে দিয়েছিল। কিন্তু এই আবু লাহাব সহ মহানবীর স্বগোত্রীয় অন্যান্যদেরকে যখন মহানবি সা. পবিত্র কুরআনের দিকে আহবান জনালেন, তখন আবু লাহাব মহানবিকে ভর্ৎসনা করে তার মাথা মুবারকের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরায়ে লাহাব নাযিল করেছিলেন।

تبت يدا ابى لهب وتب الخ

আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে ... সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। মহানবি সা. এর জন্মানন্দের পরও আবু লাহাবের উপর এমন শাস্তির বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, মহানবি সা. এর উপর নাযিলকৃত কুরআনের বিধান ও তার জীবনাদর্শ গ্রহণ না করে শুধু মাত্র তার জন্মানন্দ প্রকাশ করাটা জাহান্নাম থেকে চিরমুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

অথচ আজ মিলাদুন্নবীর নামে তাই করা হচ্ছে।

সিরাতুন্নবী সা. এড়িয়ে মিলাদুন্নবী গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য কি?

১২ রবিউল আউয়ালে মাজারপন্থীরা জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীর সময় স্লোগান দেয়, সীরাতুন্নবীকে লাথি মার (নাউযুবিল্লাহ) মীলাদুন্নবী গ্রহণ কর। অথচ সীরাতুন্নবীর হাকিকত (নিগূঢ় রহস্য) হল, কুরআনের

বিধান ও মহানবি সা.এর জন্মদিনের ঘটনাবলী আলোচনা করা। যেহেতু এ আলোচনায় করণীয় বর্জনীয় কোনো বিষয়বস্তু থাকে না। ফলে এমন অনুষ্ঠান করতে কারো কষ্ট হয় না। যেমনি ভাবে মহানবি সা. এর জন্মানন্দের অনুষ্ঠানে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হালাল খাওয়া,পর্দা করা, দাড়ি রাখার কথা আলোচনায় আসবে না। তেমনি ভাবে মদ গাজা, চুরি, ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি বর্জনের কথাও আলোচনায় আসবে না। কেননা মহানবি সা. এর জন্মের ৪০ বছর পর কুরআন ও ইসলামি বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং জন্মের অনুষ্ঠানে করণীয় বর্জনীয় কোনো কিছুর আলোচনা হবে না। পক্ষান্তরে সীরাতুন্নবী সা. এর আলোচনা করতে গেলেই অনেক করণীয় কাজ করতে হয় এবং বহু নিন্দনীয় কাজ (স্বয়ং ঈদে মীলাদুন্নবী সা. নামক অনুষ্ঠানও) ছাড়তে হয়। কারণ আল্লাহর নবি সা. পুরা জীবনে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি। এ জন্যেই তারা সীরাতুন্নবীকে বাদ দিয়ে মীলাদুন্নবীর স্লোগান দেয়। আল্লাহ পাক সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে ঈদে মীলাদুন্নবী, মিলাদ-কিয়াম নামক গর্হিত বিদআত কাজ থেকে বেঁচে থেকে রাসূল সা. এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

জশনে জুলুস সম্পর্কে তথাকথিত সুন্নীদের দলীল ও এর খণ্ডন

২ নং প্রশ্নঃ যারা জশনে জুলুস ও ঈদে মীলাদুন্নবী সাঃ উদযাপন করে তারা তা কোন দলিলের ভিত্তিতে করে এবং তাদের দলিলগুলো কতটুকু নির্ভরযোগ্য? আশা করি এ ব্যাপারেও সঠিক দিকনির্দেশনা দিবেন।

২। সমাধান: বিদআতপন্থী আলেমগণ নিজেদের বিদআতকে সুন্নাত ও শরীয়ত সম্মত প্রমাণ করার জন্য কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, যেমন তারা প্রচলিত মীলাদ মাহফিলকে জায়েজ প্রমাণ করার জন্য কুরআন শরীফের এই আয়াত পেশ করে–

ورفعنا لک ذکرک

“আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি” অর্থাৎ আমি আপনাকে নবী বানিয়েছি, আসমান ও জমিনে প্রসিদ্ধ করেছি, এবং পুরা বিশ্বের আনাচে কানাচে আপনার আলোচনাকে সম্প্রসার করেছি, যাতে সবাই আপনার আলোচনা করে। এবং আপনার উপর দরুদ পাঠ করে। এ আয়াত দ্বারা মীলাদ শরীফের বৈধতা প্রমাণ হয়। কেননা মীলাদ মাহফিলে

আল্লাহর নবির জন্ম, মোজেজা ইত্যাদি বিষয়ে যতবেশী আলোচনা করা হয় তা অন্য কোন ওয়াজের মজলিস অথবা কুরআন হাদিসের দরসে হয় না। সুতরাং মিলাদ শরীফ সুন্নাত বিদআত নয়।

যেমন তাদের কিতাব আনওয়ারে সাতেয়ায় আছে—

قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعنى فرمايا الله تعالى ني رسول خدا صلى الله عليه وسلم كو تحقيق بلند كيا هم ني تيرا ذكر كو يعنى هم ني تم كو نبى بنايا اور مشهور كيا زمين واسمان مين اور فهيلايا ذكر تمهارا دنيا كي انتهائى كنارون تك اور تمهارا ذكر دلون مين محبوب ومطلوب كر ديا- خيال كرنا ساهي كه يه معنى بخوبى صادق اتى هين محفل ميلاد فر بيشك يه محفل قدس منزل مضمون اية ورفعنا لك ذكرك مين داخل هي اس لئي كه اس محفل مين كثرت هوتي هي درود شريف كي اسقدر كه نهى هوتى اور كسى مجالس وعظ وتدريس مين اور بيان هوتا هي حضرت صلى الله عليه وسلم كي نور كا اور ظهور معجزات وكرامات كا جو وقت ولادت اور رضاع اور قبل نبوت اور بعد نبوت ظاهر هوئى الخ: انوار الساطعة بحواله البراهين القاطعة صف ٢٢-٣٢١

এমনিভাবে তারা

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الخ واما بنعمة ربك فحدث الخ هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الخ قل بفضل الله و برحمته فبذالك فاليفرحوا الخ

দ্বারায় ও মীলাদ শরীফের বৈধতার প্রমান দেয়। جاء الحق صف ٣١-٢٣٠

এ ব্যাপারে ওলামায়ে দেওবন্দ তথা প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরামের ভাষ্য হল,

নবি করিম (সা.) এর জীবনালোচনা একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত এবং ঈমানের প্রাণ, নবি জীবনের প্রতিটি ঘটনা উম্মতের মনোচোখের সুরমা। তার জন্ম, শৈশব, যৌবন, নুবওয়ত লাভ, দাওয়াত, জিহাদ, আত্মত্যাগ, যিকির-ফিকির, ইবাদত-বন্দেগী, অভ্যাস, চরিত্র, আচার-আচরণ, আকার-আকৃতি, গুণাবলী, দুনিয়া বিমুখতা ও পরহেযগারী, জ্ঞান-গরীমা, আল্লাহর ভয়, উঠা-বসা ও চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ, যুদ্ধ, রাগ, দয়া, হাসি-কান্না, এক কথায় তার প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি পদক্ষেপ উম্মতের জন্য উত্তম

আদর্শ ও হিদায়েতের মহৌষধ। এগুলো নিজে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অন্যদেরকে এগুলোর প্রতি আহ্বান করা উম্মতের গুরুদায়িত্ব। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর। এমনি ভাবে তার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ ও বস্তুসমূহের আলোচনা ও ইবাদত। তার বন্ধু-বান্ধব, সাহাবা, স্ত্রীবর্গ, সন্তান-সন্ততি, সেবক ও খাদেম, তার পোশাক-পরিচ্ছেদ অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, খচর ও উট প্রভৃতির আলোচনাও ইবাদত। কারণ তা মূলত এসকল বস্তুর আলোচনা নয় তা বরং নবীজির (সা.) সম্পর্কের আলোচনা। (ইখতেলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকিম পৃষ্ঠা-৬২)

বছরের প্রতিটি মাস, মাসের প্রতিটি সপ্তাহ এবং সপ্তাহের প্রতিটি দিন ও দিনের প্রত্যেকটি ঘণ্টা-মিনিটের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত নেই যে সময় রাসূল (সাঃ) এর জন্মবৃত্তান্ত বা জীবনী আলোচনা করা খুবই বরকতময় মুস্তাহাব কাজ নয়। এ বিষয়ে ওলামায়ে দেওবন্দ ও প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, ১২ রবিউল আউয়ালের দিন-ক্ষণ ঠিক করে মিলাদ মাহফিলের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জশনে জুলুসের বিশেষ আয়োজন, আলোকসজ্জা ও মিষ্টি বিতরণের তোড়জোড় এবং ব্যাপক চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে উরসুন্নবী উদযাপনের কোন দৃষ্টান্ত সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের যুগে ছিল কিনা? যদি থেকে থাকে তাহলে কোন মুসলমানের পক্ষে এতে সামান্যতম আপত্তি করার কোন অধিকার নেই। কারণ তারা যা করেছেন ও যা থেকে বিরত ছিলেন সত্যিকারের দ্বীন হল তাই। নবুওয়াত লাভের পর হুজুর পাক (সাঃ) দীর্ঘ তেইশ বছর দুনিয়ায় ছিলেন। তার পর ত্রিশ বছর খেলাফতে রাশেদার আমল চলে। অতঃপর একশ দশহিজরী পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের যুগ চলে। তার পর দু'শ বিশ হিজরী পর্যন্ত তাবেঈন তাবে তাবেঈনের যুগ অতিবাহিত হয়। নবী প্রেমে তারাই ছিলেন সর্বাধিক উজ্জীবিত এবং শরিয়ত পালনে অগ্রগামী। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে তারা তুলনাহীন।

মীলাদপন্থী ওলামায়ে কেরাম লক্ষ লক্ষ সাহাবী, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের কোন একজন থেকে কি প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল ও জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী নামক আচার অনুষ্ঠান

প্রমাণ করতে পারবেন? আমাদের দাবী, কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবেন না। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, এমন সাওয়াবের মুবারক আমলটির প্রচলন সেই পুণ্য যুগসমূহে কেন ছিল না? তারা মীলাদের যে বরকত ও ফাযায়েল বর্ণনা করেন, তা পূর্বের যুগে শোনা জায়নি কেন? মূল কথা হল, হযরত নবী করীম (সা.) ও তিন পূণ্যযুগের (সাহাবী তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগে যা হাদীসে শ্রেষ্ঠতম যুগ বলে অবহিত) লোকেরা যা করে গেছেন ও বলে গেছেন তাই দ্বীন ও শরীয়ত। আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

بمصطفی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست* اگر بادنہ رسیدی تمام بولہبی ست

নিজেকে মুহাম্মদ মোস্তফার দ্বারপ্রান্তে পৌছাও। যদি তা না হয় তবে সবই আবু লাহবের কান্ডকীর্তি।

শেষ কথা হলো, হুজুর (সা.) এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা এক কথা আর মীলাদ-কেয়াম ও জশনে-জলুসের আসর জমানো অন্য কথা। প্রথমটি মুস্তাহাব, দ্বিতীয়টি বিদয়াত। (রাহে সুন্নাত ১৬১)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الخ* واما بنعمة ربك فحدث* ورفعنا لك ذكرك* هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق* قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الخ

ইত্যাদি আয়াতসমূহে প্রথমটি অর্থাৎ জন্মবৃত্তান্ত আলোচনার কথা বলেছেন। দ্বিতীয়টি তথা দিন-তারিখ ঠিক করে یانبی سلام علیک،یا رسول سلام علیک নামক ভুল ও বানোয়াট কসিদা সুরে সুরে তালে তালে গাওয়ার কথা বলেননি (নাউযুবিল্লাহ)

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত সমূহকে মীলাদ-কেয়ামের বৈধতার প্রমান স্বরূপ পেশ করা কুরআনের অর্থ বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের কে হেফাযত করুন আমিন। ইমামুল হিন্দ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (মৃত্যু ১৩২৩হি) রহ. লিখেন- নবীজীর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা মুস্ত াহাব। কিন্তু এর সাথে বিভিন্ন বিদআত যুক্ত হওয়ায় ঐ সব মাহফিলকে শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া পৃঃ১০২-১১০)

সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এরা কি মীলাদ পড়েছিলেন?

(২) মীলাদপন্থী তথাকথিত ওলামারা মীলাদ কেয়ামের বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলে থাকেন "সাহাবায়ে কেরাম রা., তাবেঈন,তাবে তাবেঈনসহ, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন রহ. সবাই মীলাদ পড়তেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. তাবেঈনদের মজলিসে নবী সা. এর ফাজায়েল ও মুজেজা তথা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করতেন এবং এটিকে ফজিলতের কাজ মনে করতেন। তাবেঈনরা তাবে তাবেঈন এর মজলিসে আলোচনা করতেন। এমনি করে তা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। যদি এরকম আলোচনা নিষেধ হত তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রা. সর্বপ্রথম আলোচনা বন্ধ করাতেন। ফলে আমাদের পর্যন্ত আল্লাহর নবীর ফাজায়েল মানাকেব এসে পৌছত না। যখন আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে। সুতরাং বুঝা গেল তারা সকলেই মীলাদ-কেয়াম করতেন। তাদের কিতাব আনওয়ারে সাতেয়ায় আছে–

اور جو کچه روایا ت و معجزات و فضائل سید الکائنات بیان کی جاتي ہیں وہ روایتیں ہیں کہ انکو صحابہ ني مجالس تابعین میں اور تابعین ني مجالس تبع تابعین میں بیان فرمایا اسطرح طبقة بعد طبقة ذکر ہوتا ہوتا ہم تک آ پہونچا- اگر یہ قصہ اور یہ ذکر ممنوع ہوتا نہ ہم تک وہ فضائل پہنچتي نہ ہم مجالس اور محافظ میں ان ذرائع اور مناقب کو بفحوائے آیة کریمہ ورفعنالک ذکرک آفاق میں منتشر اور مشہور کرتي انوارالساطعة بحوالہ البراهین القاطعةصـ ٣٢٣

তাদের কিতাব وجاء الحق আছে–

ہر زمانہ اور ہر جگہ میں علماء اور اولیاءمشائخ اور عامة الناس اس میلاد شریف کو مستحب جان کر کرتي رہي جاء الحق صــ ٢٣٥

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাষ্য

তাদের এসব কাণ্ডজ্ঞানহীন কথার উত্তর দিতেও আমাদের লজ্জা হয়। আমি কি বলি আর আমার তামবুরা (অনুসারি) কি বলে? কারণ আমাদের আলোচনা চলে আসছে প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল ও জশনে জুলুস সম্পর্কে। তা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যামানায় ছিল কিনা? কিন্তু তারা প্রচলিত মীলাদ মাহফিলের প্রমাণ দিচ্ছে সাহাবায়ে

কেরাম তাবেঈনদের মজলিসে নবীজির ফাজায়েল মানাকেব বর্ণনা করতেন বলে। বড়ই অদ্ভুত প্রমাণ! দাবী করল কী, আর প্রমাণ দিল কিসের? নবিজীর ফাজায়েল-মানাকেব বর্ণনা করার ব্যাপারে তো কারো কোন আপত্তি নেই এবং থাকার কথাও নয়। আপত্তি হল প্রচলিত নিয়মে প্রতি বৎসর রবিউল আউয়ালে ১২ তারিখকে নির্দিষ্ট করে বিপুল পরিমাণ অর্থ অপব্যয় করে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীর আয়োজন করা নিয়ে। এরকম জশনে জুলুস ও মিলাদ কিয়াম সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল কিনা? এ ব্যাপারে আমাদের আলোচনা হলো, আসলে এসব আচার অনুষ্ঠান যে সাহাবা তাবেঈন তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের যামানায় ছিল না তা তারা নিজেরাও জানে। যেমন প্রচলিত মীলাদ অনুসারীদের অন্যতম রাহবার মাঃ সালামত উল্লাহ সাহেব আদ্দুররুল মুনায্যমের ৭২ পৃষ্ঠায় লেখেন–

অর্থাৎ: সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এ মীলাদের সূচনা করেন তিনি ছিলেন শেখ ওমর বিন মোল্লা মুহাম্মাদ মাওসেলী। আর যে বাদশাহ র্সব প্রথম এর প্রচলন করেন তিনি হচ্ছেন মুযাফফর উদ্দিন আবু সাঈদ কাওকরী বিন যাইনুদ্দীন (আরবলের বাদশাহ)। ইতিহাস অধ্যয়নে একথা জানা যায় যে, এ বাদশাহ মুযাফফর ইরাকের অন্তর্গত মাওসিল শহরে ৫৪৯ হিজরী সনে জম্মগ্রহণ করত: ৬৩০ হি: সনে প্রায় ৮১ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (তারিখে মীলাদ ২১-২২ হিজঃ) উল্লেখ্য যে, এ বাদশার নাম কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন– মুযাফফর উদ্দীন, আর কেউ বলেছেন ইবনে মুযাফফর। আবার কেউ কেউ শুধু মুযাফফরও বলেছেন। সে যাই হোক, মীলাদ কেয়াম, জশনে জুলুস যে নবী, সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের যুগে ছিল না তা প্রমাণ হয়ে গেল। আর বিদআতীরা যে নিজেদের পেট ঠিক রাখার জন্য কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যার সাথে সাথে সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের উপর অপবাদ দিতে পারে তাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল।

মুসলমান যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছেও ভালো

(৩) বিদআতপন্থী তথাকথিত ওলামারা মীলাদ-কেয়ামসহ অপরাপর যে বিদআতকে বৈধতা দেয়ার জন্য একটি হাদীস পেশ করে থাকেন তা হল–

روى عن ابن مسعود رضى الله عنه ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

মুসলমানরা যাকে ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছেও ভালো। আর এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল ও ফাতেহাখানি ইত্যাদিকে সাধারণ মুসলমানরা ভালো মনে করে সুতরাং তা আল্লাহর নিকটও ভালো হবে, তাই এসব মোবারক অনুষ্ঠানকে বিদআত বলার কোন অবকাশ নেই।

যেমন তাদের কিতাব আনওয়ারে সাতেয়ায় আছে–

(انوار الساطعة بحواله البراهين القاطعة ص-۳۵۰جاء الحق-۲۱۹

প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামাদের ভাষ্য হাদীস নিয়ে আলোচনা

এ হাদীস সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা হল, এ হাদীস মারফু না মাওকুফ? এ ব্যাপারে গবেষণামূলক কথা হল, যদিও কোন কোন ফুকাহায়ে কেরাম এ হাদীস কে মারফু বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে এ হাদীসটি মারফু নয়। বরং মাওকুফ। হাফিজুল হাদীস আল্লামা জামালুদ্দীন জায়লায়ী হানাফী (মৃতঃ৭৬১) লিখেন– و لم اجده الا موقوفا على ابن مسعود

আমি এই রেওয়ায়েত কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হিসেবেই পেয়েছি (নাসবুর রায়া৪/১৩৩)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা সালাহ উদ্দীন আলায়ী (মৃতঃ৭৪১)বলেন–

لم اجده مرفوعا فى شيئ من كتب الحديث اصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسوال انما هو قول ابن مسعود موقوف عليه

আমি ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার পরেও কোন কিতাবে এ হাদিস কে মারফু তথা নবি করিম (সা.) এর বাণী হিসেবে পাইনি। নিঃসন্দেহে ইহা হাদীসে মাওকুফ তথা ইবনে মাসউদ (রা.) এর উক্তি"। উল্লেখ্য যে, সাহাবী গণের বাণীও শরীয়তের অন্যতম দলীল। তবে উসুলে হাদীসের স্বীকৃত নীতি অনুসারে নবি ও সাহাবির উক্তির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

হাদিসে মুসলমানগণ বলে কাকে বুঝানো হয়েছে?

দ্বিতীয় কথা হল, তারা মীলাদ কেয়ামের প্রমান স্বরুপ যে হাদীস পেশ করে "মুসলমানগণ যা ভালো মনে করেন তা আল্লাহর কাছেও ভালো" এখানে মুসলমানগণ বলে কাকে বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করা দরকার। মুসলমানগণ থেকে পুরা দুনিয়ার সব মুসলমান উদ্দেশ্য নেয়া কখনো সম্ভব নয়। কারণ যদি সব মুসলমান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উম্মতের তেহাত্তর দল সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে, কেননা তারা সকলেই স্বীয় কর্মকে ভাল বলেই বিশ্বাস করে। অথচ ইহা সহীহ হাদীস তথা ما انا عليه واصحابى মুক্তিপ্রাপ্ত ঐ দল হবে যারা আমি ও আমার সাহাবায়ে কেরামের প্রতি প্রদর্শিত মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং বুঝা গেল যে, হাদীসে মুসলমানগণ বলে কাদের কে বুঝানো হয়েছে। হাদীসটির পুরো রেওয়ায়েত পাঠ করলে এ কথা সহজেই বুঝা যাবে।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম (মৃত্যু ৪০৫)সহীহ সনদে মুস্তাদরাকে হাকেম খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-৭৮ ৩ এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رواه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ و قد راى الصحابة جميعا ان يستخلفوا ابا بكر رضى الله عنه

মুসলমানগণ যা ভাল মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভাল। তারা যা মন্দ মনে করে তা আল্লাহর নিকটও মন্দ। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর (রাযি.) এর খেলাফতকে ভালো মনে করে তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন সুতরাং তার খিলাফত আল্লাহর কাছেও ভালো। এ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্ত রেওয়ায়েতে "মুসলমানগণ" বলতে যে, সাহাবায়ে কেরামই উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতএব হাদীসের মূলার্থ হল, সাহাবীগণ যা ভালো মনে করেন তা আল্লাহর কাছেও ভাল। তারা যা মন্দ মনে করেন তা আল্লাহর কাছেও মন্দ। আর অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরামের কেউ জীবনে একবারের জন্যও আযানের পূর্বে সালাত-সালাম, চারদিনা, চল্লিশা, কুলখানি, কিয়াম, ওরশ ও জশনে-জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীর আয়োজন করেননি। কারণ তারা এ সব করাকে ভাল মনে করেননি। মন্দ মনে করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম যা মন্দ

করেছেন তা আল্লাহর কাছেও মন্দ। অতএব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উপরোক্ত হাদীসটি মীলাদ-কিয়ামসহ সমস্ত বিদআতের মুলোৎপাটনের দলীল। বিদআত সমর্থনের দলীল নয়।

৩ নং প্রশ্নঃ যারা জশনে-জুলুসের আয়োজন করে এবং যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে ও যারা অংশগ্রহণ করে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

সমাধানঃ উপরোক্ত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত জশনে-জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সাঃ একটি বিদয়াত ও শরীয়ত গর্হিত কাজ। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং যারা জশনে-জুলুসের আয়োজন করে আর যারা তাতে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে তারা প্রকারান্তরে একটি বিদয়াত কাজ করল ও তাতে সহযোগিতা করল। আর যারা বিদআত কাজ করে কিংবা তাতে সহযোগিতা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী সা. হাদিস শরীফের জায়গায় জায়গায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

(١)عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل بدعة ضلالة (مسلم شريف جـ١صـ٢٨٤/٨٥) وفى رواية النسائي كل ضلالة فى النار جـ١ص ١٧٩

১। নবি কারিম সা. ইরশাদ করেন, জেনে রাখো সর্বোত্তম বর্ণনা হল আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন। সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ সা. এর আদর্শ। আর সর্বনিকৃষ্ট কাজ হল বিদআত তথা নবাবিস্কৃত বিষয়সমূহ। প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

(٢) عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من احدث فيها حدثا او اوي محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل (بخارى جـ١صـ٢٥١ المكتبة الاسلامية بنغلا بازار داكا

২। রাসূল সা. ইরশাদ করেন। যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে কোন বিদআত আবিষ্কার করবে অথবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ ও তার ফিরিশ্তা এবং সমস্ত মানবজাতির লানত। তার ফরজ বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।

(٣)عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا انهم إنماهم اصحاب البدع واصحاب الاهواء واصحاب الضلالة من هذه الامة يا عائشة ان لكل صاحب بدعة ذنب غير اصحاب البدع و اصحاب الاهواء ليس لهم توبة و انا برئ منهم و هم منا براء(تفسير قرطبى تحت قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم الخ سورة الانعام الاية ١٠٩ ج٧صـ٩٧دار الكتب العلمية بيروت لبنان بحواله جواهر الفتاوى جـ٤صـ١٤٤للمفتى الاعظم عبد السلام المؤقر بارك الله فى حياته اسلامى كتب خانه باكستان)

৩। হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, হুজুর সা. হযরত আয়েশা রা. কে বলেন, পূর্বেকার দিনে যারা তাদের ধর্মকে পরিবর্তন করেছে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। আমার উম্মতের মধ্যে যারা ধর্মের পরিবর্তন করবে তারা হল বিদআতী, প্রবৃত্তি পূজারী ও পথভ্রষ্ট লোক,হে আয়েশা! প্রত্যেক গোনাহগারের তাওবা কবুল করা হয় কিন্তু বিদআতী ও প্রবৃত্তি পূজারীদের নয়। তাদের সাথে আমার কোন প্রকারের সম্পর্ক নেই।

(٤)عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انى فرطكم على الحوض من مر على شرب و من شرب لم يظمأ ابدا ليردن على اقوام اعرفهم و يعرفوننى ثم يحال بينى و بينهم فاقول انهم منى فيقال انك لا تدرى ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدى متفق عليه (بخارى جـ٢ص٩٦٥مسلم جـ٢صـ٣٨٤مشكوة باب الحوض و الشفاعة جـ٢صـ٤٨٧)

৪। হযরত সাহাল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজে কাউছারে পৌছব। যে আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে সে হাউজে কাউছারের পানি পান করবে, যে একবার এই পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। এমন একটি দল আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে যাদের আমিও চিনব তারাও আমাকে চিনবে। অতপর আমাদের মাঝে একটি পর্দা পড়বে।

আমি বলব, তারা তো আমার উম্মত। বলা হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পরে দ্বীন ইসলামে কোন কোন জিনিষ আবিস্কার করেছে। আমি বলব, দূর হও, দূর হও যারা আমার পরে আমার আনিত দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে।

(৫)عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة حرام ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل(بخاری ج٢ص١٨٤مسلم ج١ص١٤٤

৫। নবি কারিম সা. ইরশাদ করেন, মদিনা মুনাওয়ারার ইর থেকে সাউর পর্যন্ত হারামের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তথায় কোন বিদআতের আবিস্কার করল অথবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিল তার উপর আল্লাহ, তার ফিরিশ্‌তা এবং সমস্ত মানবজাতির অভিশাপ। তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।

৬। হযরত সুফিয়ান সওরী রহ. বলেন-

(٦) البدعة احب الى ابليس من المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها((تفسير قرطبى تحت قوله تعالى وان هذا صراطى مستقيما الخ سورة الانعام الآية٥٣ج٧ص٩٢ب والہ جواهرالفتاوى ج٤ص١٤٩)

(৬) বিদআত ইবলিসের নিকট গোনাহ থেকে অধিক পছন্দনীয়। কারণ গোনাহ থেকে সাধারণত তাওবা করা হয় কিন্তু বিদআত কাজকে যেহেতু সাওয়াব মনে করে করা হয় সেহেতু তাওবা করার সুযোগ হয় না।

(٧) عن ابراهيم بن ميسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام رواه البيهقى فى شعب الايمان مرسلا ج٧ص 16رقم الحديث ٩٤٦٤

৭। নবি কারিম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান প্রদর্শন করল, সে দ্বীনে ইসলামকে ধ্বংস করতে সহযোগিতা করল।

(٨) عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة

৮. হযরত আনাস বিন মালেক রা. (মৃত.৯০ হি.)হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক বিদআতী ব্যক্তি থেকে তাওবাকে বিরত রেখেছেন। অর্থাৎ তারা যেহেতু বিদআত কে ইবাদত মনে করে সম্পাদন করে এ জন্য সাধারণত বিদআত থেকে তাওবা করার তাওফিক হয় না। (মাজমাউয জাওয়ায়েদ ১০/১৮৭)

(٩)بلغنى انه قد احدث فان كان قد احدث لا تقرئه منى السلام

৯.হরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এক ব্যক্তি সর্ম্পকে বলেন.

আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, অমুক ব্যক্তি বিদআত সৃষ্টি করেছে, বাস্তবেও যদি সে বিদআত সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে তাকে আমার সালাম বলবে না। (তিরমিযি ২/৩৮)

(١٠) عن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليه الى يوم القيامة(مشكوة ج١ ص٣١

১০. হযরত হাসসান রা. বলেন, কোন জাতি যদি তাদের ধর্মের মাঝে অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ঐ পরিমাণ সুন্নাত তুলে নিয়ে যান যা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট আর ফিরে আসবে না।মিশকাত শরাহ খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩১)

সুতরাং যারা জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীর আয়োজন করে, তাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করে, সবার ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীস সমূহের সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

৪. প্রচলিত মীলাদ কেয়ামের শরয়ী হুকুম কি?
(প্রচলিত কিয়ামের ইতিহাস)

সমাধানঃ আমাদের দেশে যে প্রচলিত মীলাদ ও কেয়াম অনুষ্ঠিত হয় তাও বিদআত। সাহাবা, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না। প্রচলিত মীলাদের ইতিহাস উপরে বর্ণিত হয়েছে, ৬০৪ হিজরিতে ইরাকের মৌসল শহরে এর সূচনা হয়। প্রচলিত কিয়ামের ইতিহাস হল, ৭৫৫ হিজী মোতাবেক ১৩৬৬ সালে খাজা তকিউদ্দীন সুবকি মালেকি রহ.(৬৭৩-৭৫৬ হি.) এর দরবারে জনৈক কবি নবি সা. এর শানে প্রশংসা সম্বলিত আবেগপূর্ণ কবিতা পাঠ

করেন। তখন তার গালাবায়ে হালের (ইশকের কারণে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে) কারণে তিনি দাঁড়িয়ে যান। সুফিয়ায়ে কিরামের সহাবস্থানের আদব রক্ষার্থে উপস্থিত ভক্তগণও তখন দাঁড়িয়ে যান। এর পর থেকে কিয়ামের প্রচলন ঘটে। মূলত উপরোক্ত ঘটনা কখনো কিয়ামের বৈধতার প্রমাণ হতে পারেনা। কারণ-

(১) সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের স্বর্ণ যুগে (যে যুগের আমল সাধারণত শরিয়তের প্রমাণ হয়) প্রচলিত কিয়ামের কোনোও অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এরপর কোন বুযুর্গের আমলকে শরিয়তের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা সমীচিন হবে না।

(২) আল্লামা সুবকি রহ. ছিলেন মালেকি মাযহাবের অনুসারী। সুতরাং তার আমল হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের জন্য দলিল হতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি তা আমল করার বিষয় হত, তাহলে মালেকি মাযহাবের অনুসারীরা সর্বপ্রথম কিয়াম করত, অথচ তাদের মধ্যে এর কোনো প্রচলন নেই।

(৩) খাজা সাহেব জীবনে মাত্র একবার কিয়াম করেছিলেন, তাও ওয়াজদ (আবেগী) অবস্থায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রচলিত মীলাদ তার নিকটও শরিয়ত সম্মত ছিল না। না হয় তিনি শুধু একবার করে ক্ষ্যান্ত হতেন না।

(৪) আবেগী ব্যক্তির বিশেষ আমল অন্যের জন্য দলিল বা অনুকরণীয় হয় না। অন্যথায় কিয়াম পন্থীদের উচিৎ হযরত ওয়ায়েস করণী রহ. এর ন্যায় সমস্ত দাঁত উঠিয়ে ফেলা।

৫. তেমনিভাবে আল্লামা সুবকি রহ. যে মজলিসে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা কোনো মীলাদের মজলিস ছিল না। ঐ মজলিসে কবিতা পাঠের পূর্বে দরুদ সালামের পাঠও হয়নি বরং তা দরসের মজলিস ছিল। তাই দরসের মজলিসের কিয়াম দ্বারা মিলাদের মাঝে কিয়াম প্রমাণ করা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন। (তারিখে মিলাদ ১২৭)

মিলাদ ও কিয়ামের ইতিহাস দ্বারা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সর্বপ্রথম যিনি মিলাদ মাহফিলের প্রচলন ঘটান তিনি কিয়াম

করেননি। অনুরুপভাবে যিনি সর্বপ্রথম কিয়াম করেছিলেন তিনি মিলাদ পড়েননি। এখন মীলাদ পন্থীরা উভয় টিকে মিলিয়ে ঝগা খেচুড়ি বানিয়ে ফেলেছে। এটাও একথার প্রমাণ যে, মিলাদ কিয়াম কুরআন হাদিস তথা শরিয়ত সম্মত নয় বরং তা একদল ভণ্ডদের নিজেদের বানানো। যার থেকে সমস্ত মুসলমানদের বেচে থাকা একান্ত কর্তব্য। এজন্যেইতো প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম বিদআত হওয়ার ব্যাপারে চার মাজহাবের ইমাম ও ফকিহগণ একমত। আহমদ বিন মুহাম্মদ মিসরী লিখেন-

قد اتفق المذاهب الاربعة بذم هذاالفعل

আলেমগণ প্রচলিত মীলাদ ও কেয়াম বিদআত হওয়ার ব্যাপারে একমত। (আল মিনহাজুল ওয়াজেহা পৃঃ ২৫৩)

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ. লিখেন-

و نظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده و وضع امه له من القيام ايضا بدعة لم يرد فيه شيئ

অনুরুপভাবে অনেককেই হজুর সা. এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা শোনার সময় কিয়াম করতে দেখা যায়, এটিও বিদআত। কুরআন হাদিসের কোথাও এর কোনো আলোচনা আসেনি। (হিওয়ার মায়ার মালেকী পৃঃ ১৭৯)

এ বিষয়ে বিস্তারিত পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মীলাদ-কিয়ামকারী ইমামের পিছনে নামায পড়ার শরয়ী বিধান।

(৪)খ প্রশ্ন= কোনো কোনো ইমাম সাহেব শুধু মীলাদ পড়েন কিন্তু কিয়াম করেন না। আবার কোনো কোনো ইমাম ও খতিব সাহেব মীলাদ-কিয়াম উভয়টি করেন। অনেকে বলেন,তাদের পিছনে নামায পড়া যায়েজ হবে না। কথাটি কতটুকু সঠিক? জানালে উপকৃত হব।

সমাধান = মীলাদ-কিয়ামের শরয়ী হুকুমের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, মীলাদ পড়া ও কিয়াম করা বিদআত। সুতরাং যারা মীলাদ পড়ে কিন্তু কিয়াম করে না, আর যারা উভয়টিই করে তারা সবাই বিদআতী। আর বিদআতী ইমামের পিছনে নামায পড়া মাকরুহে তাহরিমী।

كما فى الدر المختار و يكره امامة فاسق و مبتدع اى صاحب بدعة و هى اعتقاد خلاف المعروف عن رسول صلى الله عليه و سلم جـ١ صـ٥٦٠ ايچ،ايم،سعيد كمپنى باكستان

ইয়া নাবী সালামু আলাইকার শরয়ী ভিত্তি

৫. প্রশ্নঃ প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামের শুরুতে যে সমস্ত দরুদ ও সালাম পড়া হয় তা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিনা? আশা করি এ ব্যাপারেও সঠিক দিকনির্দেশনা দিবেন।

সমাধানঃ দরুদ শরীফ বড় ফজিলতের আমল। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন মাজিদে দরুদ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। সিহাহ সিত্তাহসহ হাদিসের অন্যান্য কিতাবে দরুদের ফজিলত এবং বরকত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

(১)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلوة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيات ورفعت له عنه عشر درجات

১। ইমাম নাসায়ী রাহ. ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন; যে ব্যাক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে,আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। তার দশটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন। তাকে দশটি উচ্চমর্যাদা দান করেন।(নাসায়ী শরীফ, ১/১৪৫)

(২)عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلوة عن قبرى سمعته ومن صلى على نائبا ابلغته

২. হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর আমার কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে সালাত-সালাম ও দরূদ পড়বে তা আমি নিজে শুনি। আর যারা দূরবর্তী স্থানে পড়বে তা আমার নিকট (ফেরেস্তাদের মাধ্যমে) পৌছে দেয়া হয়। (বায়হাকি, মিশকাত ১/৮৭)

(৩)عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين فى الارض يبلغونى من امتى السلام

৩ . হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা ইরশাদ করেন নিশ্চয় আল্লাহর এমন কিছু ফেরেস্তা রয়েছেন যারা পৃথীবি আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিক পৌছে দেয়। (বায়হাকী, মিশকাত ১/৮৭, নাসায়ি ১/১৪৩)

(٤)عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم

৪। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিয়ে কারিম সা. ইরশাদ করেন যে, মানুষ কোন মজলিসে বসল, আর উক্ত মজলিশে আল্লাহর জিকির এবং আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করল না, তাহলে সেই মজলিশ তাদের জন্য (কিয়ামতের দিন) খারাপ পরিণতির কারণ হবে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাদেরকে মাফ করবেন। আর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন।-তিরমিযী: ২/১৭৪

(٥)عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على (رواه الترمذى)

৫.হযরত আলী রা. বলেন,রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, কৃপণ সে, যার সামনে আমার নাম নেয়া হয়, আর সে আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করে না।তিরমিযি, আহমদ, ফাতহুল করিব ৬১, সহিহ ইবনে হিব্বান ২/১৮৯

দরুদের এমন অনেক ফজিলতের বর্ণনার সাথে সাথে কোন কোন শব্দে দরুদ পড়বে তাও হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামের সময় "ইয়া নাবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা" নামে যা পড়া হয়, হাদীস গ্রন্থ বা নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে এর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এর যুগে এরকম কোন দোয়া-দরুদের প্রচলন ছিল না। সুতরাং মনগড়া একটি আরবি কাসিদাকে আল্লাহর নবির দরুদ বলা আল্লাহর নবির উপর অপবাদ দেয়ারই নামান্তর। আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار(مسلم جـ۱صـ۷المکذبۃ الاشرفیۃ دیوبند)

যে ব্যাক্তি আমার প্রতি কোন মিথ্যারোপ করবে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়। সুতরাং কুরআন-হাদীসে যার কোন ভিত্তি নেই, এরকম একটি কাসিদাকে দরুদ মনে করা মূর্খতা বৈ আর কিছু নয়। যারা এই দরুদ পড়ে না তাদের কে দরুদ বর্জন কারী ও নবির শত্রু বলে গালি-গালাজ করা ক'য়েকটি কবিরা গোনাহের সমষ্টি। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। আমিন।

কুরআনের কোথাও ইয়া নাবীর উল্লেখ নেই

দ্বিতীয়তঃ তথাকথিত দরুদটি যে বানোয়াট তা দরুদের গঠন থেকেই বুঝা যায়। অর্থাৎ তাদের বানানো দরুদটা আরবি গ্রামার অনুযায়ী অশুদ্ধ। যদি তা কুরআন-হাদীস প্রমাণিত দরুদ হত তাহলে কখনো তাতে ভাষাগত ভুল হত না। তাদের দরুদ হল,

"یانبی سلام علیک،یا رسول سلام علیک"

উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক পবিত্র কালামের কোথাও আমাদের মহানবী সাঃ কে তাঁর নাম ধরে ডাকেন নি। ডেকেছেন তার উপাধি ধরে। এবং প্রত্যেক বারই সম্মানসূচক শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করেছেন। যেমন ইয়া আইয়্যুহান্নাবী,ইয়া আইয়্যুহার রাসূল বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তাদের মত আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কোথাও ইয়া নাবি অথবা ইয়া রাসূল বলে সম্বোধন করেন নি। কারণ ইয়া নাবি অথবা ইয়া রাসূল বলে সম্বোধন করলে আরবি গ্রামার অনুযায়ী এমন নবি ও রাসূল বুঝায় যাকে ডাকার পূর্বে তিনি অপরিচিত ছিলেন। অথচ আমাদের মহানবি সা. কে এভাবে ডাকার পূর্ব থেকেই তিনি সমস্ত জগতবাসির কাছে সুপরিচিত। তাই তাকে এভাবে "ইয়া নাবি অথবা ইয়া রাসূল" বলে ডাকা তার সুপরিচিত বোধক মর্যাদার পরিপন্থি।

ইয়া নাবি সালামু আলাইকা ভুল

এ কথার বিস্তারিত বিবরণ হল, আরবি গ্রামারের পরিভাষায় যে শব্দের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ আছে এবং তা কোন কাল বা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। সে শব্দকে "ইসম" বলে। ইসম বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে একপর্যায়ে ইসম দুইভাগে বিভক্ত। এক মারেফা। দুই নাকেরা

যে ইসম অপরিচিতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাকে নাকেরা বলে। যেমন নবি শব্দটি নাকেরা। অর্থাৎ এর দ্বারা কোর পরিচিত নবি বুঝায় না। অনুরুপ রাসূল শব্দটিও। আর যে ইসম পরিচিতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাকে মা'রেফা বলে। যেমন আন্নবী শব্দটি মা'রেফা। এর দ্বারা কোর পরিচিত নবি বুঝায়, অনুরুপ আর্‌রাসূল শব্দটিও।

এমনিভাবে আরবি ভাষায় কোন ইসম মা'রেফা হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি হল, যে শব্দটি নাকেরা তার শুরুতে আলিফ লাম যুক্ত হলেই শব্দটি মারেফায় পরিণত হয়। যেমন নবি শব্দটি নাকেরা ছিল, তার শুরুতে আলিফ লাম যুক্ত করত আন্নবী বললেই শব্দটি মা'রেফা হয়ে যায়। আর যে সকল শব্দ আলিফ লাম যুক্ত হয়ে মা'রেফা হয়, সে সকল শব্দের শুরুতে যদি সম্বোধন বোধক অব্যয় পদ ইয়া যুক্ত হয় তখন আরবি গ্রামার অনুযায়ী ইয়া শব্দের পর আইয়্যুহা যোগ করতে হয়। সুতরাং ইয়া আন্নবী বলাটা শুদ্ধ নয় বরং ইয়া আইয়্যুহাননবী বলতে হবে। এভাবে ডাকলে বুঝা যাবে যে,যিনি তাকে ডাকছেন তিনি তার কাছেই শুধু পরিচিত নন বরং পূর্ব থেকেই তিনি সবার কাছে সুপরিচিত।

তার বিপরিত কেউ যদি নবি নাকেরার শুরুতে ইয়া যুক্ত করে মা'রেফা করে তখন তা শুধু সম্বোধন কারীর কাছেই পরিচিত হয়। অন্যদের কাছে নয়। বাংলা ভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন,কেউ যদি কাউকে ও.. মিঞা বলে ডাকে তখন সেই শুধু জানে যে, সে কাকে ডাকছে। এছাড়া শুধু ও.. মিঞা কথাটা শুনে অন্যদের বুঝার কোন উপায় নেই যে, এ দ্বারা কাকে ডাকা হয়েছে। অতএব, ইয়া নবি অর্থাৎ ও নবি বলে ডাকলে শুধু যে ডাকল তার কাছেই পরিচিত নবি বলে বুঝায়। অন্যদের পরিচিত বুঝায় না।

কারণ এখানে নবি শব্দ মা'রেফা হয়েছে সম্বোধনের পর। অথচ আমাদের নবি সা. পূর্ব থেকেই শুধু পরিচিতই নন বরং সুপরিচিত। কাজেই তাকে ইয়া নবি বলে ডাকা তার এহেন সুপরিচিতির পরিপন্থি। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফের কোথাও ইয়া নবি বলে সম্বোধন করেননি। ইয়া আইয়্যুহাননাবি বলেই সম্বোধন করেছেন। এমনকি নামাযে পঠিতব্য তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়্যাতুর মাধ্যমে নবীজী নিজেও আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তাকে সালাম দেয়ার সময় ايها النبى বলে সম্বোধন করার জন্য। তার পরেও বিদআতীরা নবিজীকে (আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা দেয়া পদ্ধতি ও বিধি-বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে) নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে সালাম দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়। তদুপরি নিজেদেরকে নবির আশেক বলে দাবী করত: জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করছে। আল্লাহ উম্মতে মুসলিমাকে হেফাজত করুন। আমিন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন- (শরহে জামী ১২২ পৃ:, কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও আরবি গ্রামারের দৃষ্টিতে ইয়া নবি সালামু আলাইকা- পৃঃ১৯)

৫ নং প্রশ্ন: মীলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল সাঃ এর উপস্থিত হওয়া অথবা অনুপস্থিত হয়ে অবলোকন করা তথা হাযির-নাযিরের আক্বীদা কতটুকু শুদ্ধ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধানঃ হাযির-নাযির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে হাযির-নাযির বলতে কি বুঝায় তা জেনে নেয়া আবশ্যক।

হাযির অর্থ সর্বত্র বিরাজমান। আর নাযির অর্থ সর্বদ্রষ্টা।পরিভাষায় হাযির বলতে এমন এক সত্তাকে বুঝায় যার অস্তিত্ব কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তার অস্তিত্ব একই সময় বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত থাকে। বিশ্ব জাহানের সমস্ত বস্তুর পরিপূর্ণ অবস্থা তার সামনে ভাস্যমান থাকে।

কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও আকাইদ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থবলী অধ্যায়নে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই একমাত্র সর্বত্র বিরাজমান, তিনিই একমাত্র সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহর এই বিশেষ গুণে কোন শরীক নেই। এটাই প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস। কিন্তু শিয়াদের আকীদা হল, তাদের তথাকথিত ইমামও সর্বত্র বিরাজমান। সকল বিষয়ে অবহিত। (জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৫২৮)

শিয়াদের এই আকীদায় প্রভাবিত হয়ে কোন কোন সুন্নী মহলও এই আকীদা পোষণ করে যে, হযরত নবি কারিম সা. ও হাযির-নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান। অথচ কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ ও আকায়েদের কোন কিতাবে এর কোন প্রমাণ তো দূরের কথা ইঙ্গিতও নেই।

কুরআনের আলোকে হুজুর সাঃ হাযির-নাযির না হওয়ার প্রমাণ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন-

وذا اسر النبى الى بعض ازواجہ حديثا فلما نبات بہ و اظہرہ الله عليہ عرف بعضہ و اعرض عن بعض فلما نبأهابہ قالت من انباک هذا؟ قال نبانى العليم الخبير(التحريم)[1]

এই আয়াতটি হুজুর সা. হাযির-নাযির না হওয়ার স্পষ্ট দলীল। একদা হুজুর সা. কোন একজন স্ত্রীর সাথে কোন এক গোপন বিষয় উল্লেখ করে অন্য কাউকে না জানাতে বললেন। কিন্তু ভুলবশত: তিনি তা অন্য একজন স্ত্রীর কাছে বলে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা হুজুর সা. কে ওহীর মাধ্যমে তা অবহিত করে দিলেন। "আর নবী তার কোন স্ত্রীর কাছে কোন গোপন কথা বললেন আর সে অন্যের নিকট তার কিছু অংশ প্রকাশ করল ও কিছু গোপন রাখল।" এরপর হুজুর সাঃ সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্ত্রী জানতে চাইল আপনাকে একথা কে বলেছে? রাসূল সা. বললেন, তিনিই আমাকে জানিয়েছেন যিনি আলীম ও খাবীর। (যিনি সবকিছুই জানেন ও খবর রাখেন)

উক্ত ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, স্বয়ং রাসূলের স্ত্রীরাও রাসূলকে হাযির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বাস করতেন না। যদি করতেন তাহলে এমন প্রশ্ন করতেন না। কারণ এমতাবস্থায় এমন-

قالت من انباک هذا؟

(আপনাকে কে বলেছে?) প্রশ্ন অর্থহীন ও অবান্তর। যেহেতু তিনি সর্বত্র বিরাজমান থাকায় সব কিছুই জানেন।

এরপরও রাসূল সা. বলেছেন, "قال نبانى العليم الخبير যিনি সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন। একথার দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল সা. হাযির-নাযির নন। কারণ তিনি যদি হাযির নাযির হতেন তাহলে বলতেন- আমি নিজেই তোমাকে বলতে শুনেছি। যেহেতু

তিনি হাযির-নাযির ছিলেন না তাই তিনি দেখেনওনি জানেনওনি। সুতরাং কুরআন থেকে হুজুরের হাযির-নাযির না হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আল্লামা সরফরায খান সফদর (রহ.) রচিত তাবরিদুন নাওয়াযির ফি তাহকীকিল হাযির ওয়ান নাযির।

হাদীসের আলোকে হুজুর সা. হাযির-নাযির না হওয়ার প্রমাণ

বুখারি শরিফ ২/৬৬৩ এবং আবু আওয়ানাসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এ বর্ণনা এসেছে যে, পঞ্চম অথবা ষষ্ট হিজরীতে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল।

(فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه)

তাই রাসূল সা. হার তালাশ করার জন্য সেখানে অবস্থান করলেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরামও হারটি তালাশ করতে লাগলেন। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও হারটি পাওয়া গেল না। অবশেষে রাওয়ানা হওয়ার আদেশ দিলেন। যেই আয়েশার (রাঃ) এর উটটি রাওয়ানা হওয়ার জন্য দাড়াল অমনি হারটি উটের নীচে পতিতাবস্থায় পাওয়া গেল। এ ঘটনার দ্বারাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাঃ হাজির-নাজির ছিলেন না। যদি হাযির-নাযির হতেন তাহলে তো এত খোঁজা-খুঁজির কোনই প্রয়োজন হতো না, কারণ তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান। সেহেতু তাঁর অজানা থাকার কথা নয় যে, হারটি কোথায় পতিত হয়েছে। এত দূর যাওয়ারও দরকার নেই, তিনি তো পতিত হওয়ার সময়ই দেখার কথা। তাহলে কি তিনি দেখেও চুপ ছিলেন। এমন প্রশ্ন করা নিশ্চয় অবান্তর নয়? উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল স. হাযির-নাযির নন।

ফিকহ ও ফতোয়ার আলোকে হুজুর সা. হাযির-নাযির না হওয়ার প্রমাণ

رجل تزوج امرأة بغير شهود فقال الرجل والمراة خدائے را و پیغمبر را گواه کردیم قالوا یکون کفراً لانہ اعتقد ان رسول الله صلى الله عليہ و سلم يعلم الغيب وهو ما كان يعلم الغيب حين كان فى الاحياء فكيف بعد الموت؟

কোন ব্যাক্তি তার বিবাহর সময় যদি হবু স্ত্রীকে বলে "আমি আল্লাহ ও রাসূল সা. কে সাক্ষী রেখে তোমাকে বিবাহ করলাম" ফুকাহায়ে কেরাম এরূপ উক্তিকে কুফরী বলেন। কেননা সে এ আক্বীদা পোষণ করল যে, রাসূল সা. গায়েব জানেন। অথচ তিনি জীবিতাবস্থায় গায়েব জানতেন না। ফলে মৃত্যুর পর কিভাবে গায়েব জানবেন?

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

(কাযীখান খণ্ড ৩. পৃঃ৫৭৬ আলা হামেশে হিন্দিয়া, জাকারিয়্যা। বাহরুর রায়েক ৫/১৬ আলমগিরি ২/৪১৬ এবং শরহে ফিকহে আকবর পৃঃ১৮৫।)

সুতরাং যেসব ইমাম ও খতিব নবি করিম সা. কে সর্বত্র হাযির-নাযির, আলিমুল গায়েব ও নূরের তৈরী বলে বিশ্বাস করে, মাটির তৈরী হওয়াকে অস্বীকার করে ঐ সব ইমাম ও খতিবের জন্য নতুন করে ঈমান আনা এবং নিজের বিবাহকে দোহরানো ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নতুন করে ঈমান আনবেনা তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েজ হবেনা।

জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া ৪/৭৭-১০৮ ইসলামি কুতুব খানা, বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান।



সমাধানে
হোসাইন আহমদ (জাবের) ফেনবী
ইফতা সমাপনী বর্ষ,
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৭/৪/১৪৩৪হি.
২৮/২/২০১৩ইং.



দেশবরেণ্য মুফতিয়ানে কেরাম ও আলেমগণের সত্যায়ন

আল্লামা শাহ আহমদ শফি
মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

আল্লামা মুহাম্মাদ হারুন
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব
দারুল উলূম হাটহাজারী

আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

আল্লামা শামসুল আলম
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মাও: মকবুল হোসাইন
শায়খুল হাদিস:
জামিয়া কারিমিয়া আরাবিয়া

মুফতি হেমায়েতুল্লাহ
প্রধান মুফতি: ফাতওয়া বিভাগ
জামিয়া কারিমিয়া আরাবিয়া

আল-জামিয়া আল-ইসলামীয়া পটিয়ার ফতোয়া

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
ইসলামী আইন ও গবেষনা বিভাগ



الجامعة الاسلامية، فتية، شيتاغونغ، بنغلاديش
ادارة الافتاء والارشاد والبحوث الاسلامية

বরাবর,
মুফতিয়ানে কেরাম,
ইসলামি আইন গবেষণা বিভাগ, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া।

বিষয়: প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. প্রসঙ্গে।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।
প্রশ্ন:(১) প্রচলিত জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সা. শরিয়ত সম্মত কি না? আশা করি এ ব্যাপারে কুরআন হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির আলোকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।
প্রশ্ন:(২) যারা জশনে জুলুস ও ঈদে মীলাদুন্নবী সা. উদযাপন করে তারা তা কোন দলিলের ভিত্তিতে করে এবং তাদের দলিলগুলো কতটুকু নির্ভরযোগ্য? আশা করি এ ব্যাপারেও সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন।
প্রশ্ন:(৩) যারা জশনে জুলুসের আয়োজন করে এবং যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে ও যারা অংশগ্রহণ করে তাদের ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কি?

আবেদনে:
জোবায়ের বিন জাকের
সিন্দুরপুর, দাগনভূঞা, ফেনী

শরয়ী সমাধান

(১) এটি শরিয়ত সম্মত নয়। কেননা পবিত্র কুরআন হাদিস ও মুসলমান জাতির সোনালী যুগ তথা খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে তার কোন অস্তিত্ব ও প্রমাণ ছিল না। সুতরাং এটি একটি ধর্মীয় আবরণে কুসংস্কার ও বিদআতে সায়্যিআহ। যার মূল উদ্দেশ্য মুসলমান জাতিকে আসল ধর্মীয় কাজ থেকে বিমুখ করে অন্য জাতির ন্যায় রং-তামাশায় লাগিয়ে দেয়া।

(২) তাদের দলিল তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করবেন।তারা যদি কোন দলিল দেয় তখন সেই দলিল সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য করতে পারবো।

(৩) তারা একটি শরিয়ত গর্হিত কাজে সহযোগিতার কারণে গুনাহগার হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকট কঠোর জবাবদিহীতার সম্মুখিন হতে হবে।

শরয়ী প্রমাণাদি

ما فى القران الكريم-

(١) لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا (احزاب:٢١)

(٢)ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو(الحشر: ٧)

(٣) تعاونو على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: ٢)

(٤)يا اهل الكتاب لا تغلو فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل (المائدة: ٧٧)

الجامع لأحكام القران

اياكم والغلو فى الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين

ما فى صحيح البخارى:(١-٣٧١)

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فى امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

وفى سنن أبى داوٗد(٤-٣٢٩)

عن انس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر

وفى سنن أبى داوٗد(٤-٣٢٩)

اياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

مافى المدخل(ج٢ ص٣)